সম্পাদকীয় ঃ

সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ–

"অর্থনৈতিক সুবিচার একটি চমৎকার শ্লোগান। বিষয়টাতে, যেহেতু অন্যান্য সবাইকে বাদ রেখে, একচেটিয়া করে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালান হয়, সেহেতু এই শ্লোগানটি মুক্ত বাজার অর্থনীতির পুঁজিবাদী সমাজেও যেমন, তেমনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক সামাজিক মতবাদেও সমভাবেই উচ্চারিত হয়ঃ উভয়পক্ষই সুবিচারের কথা বলে। কিন্তু এতে উভয়পক্ষই 'অর্থনৈতিক সুবিচার'-এর সোনালী নীতির প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে।................

ইসলাম এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলে, যাতে সরকারগুলোকে এবং বিত্তবানদেরকে বার বার মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, তাদের নিজেদের স্বার্থেই তাদেরকে একটি সুষম অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদেরকে বারবার এই উপদেশও মেনে চলতে বলা হয়েছে যে, তারা যেন অন্যান্যদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। দুর্বল ও দরিদ্রকে যেন তাদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার থেকে কখনোই বঞ্চিত রাখা না হয়। তাদের প্রত্যেকের পেশা পসন্দ করবার স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধার সমান প্রাপ্যতা, এবং জীবনধারণের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার থাকতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই মানবেতিহাসে ইতোমধ্যেই উত্তরণের জন্য সংগ্রামের পথে বহু দুঃখ-বেদনা এবং বিশৃংখলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই, ইসলামে 'নেওয়ার' বা 'রাখার' চাইতে অধিক জোর দেয়া হয়েছে 'দেওয়ার' উপর। সরকারগুলোকে এবং বিত্তশালীদেরকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমাজে যেন এমন কোন অংশ রয়ে না যায়, যারা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার মৌলিক মানবাধিকার সমূহ থেকে বঞ্চিত। একটি প্রকৃত জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রকে তার প্রয়োজন কি, তা জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং পূরণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। দুঃখ-যন্ত্রণার আর্তনাদ প্রতিবাদে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই এবং প্রয়োজন বা চাহিদার কারণে শান্তি ও শৃংখলা নষ্ট হওয়ার পূর্বেই দুঃখ-যন্ত্রণার কারণসমূহ দূরীভূত করতে হবে এবং প্রয়োজনসমূহ মেটাতে হবে।" (`Islam's Response to Contemporary Issues` পুস্তক হতে উদ্ধৃত।)

কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) প্রদত্ত এ নির্দেশনার আলোকে আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ দৃষ্টি দেবে কি!

আমাদের প্রত্যাশা–বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সরকার এ নীতিমালা অনুসরণ করে সময়ের চাহিদা পূরণে তৎপর হোন।

১৫ অক্টোবর ২০০৮

সূচী পত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** — ৪
- **হাদীস শরীফ** — ৫
- **অমৃত বাণী** — ৬
- *জুমুআর খুতবা ঃ* — ৭-১২
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- *জুমুআর খুতবা ঃ* — ১৩-১৯
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **কুরআন আমার প্রিয় কুরআন** — ২০-২৪
  আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
- ইসলামে খিলাফতই মুক্তির একমাত্র সত্য সঠিক সোজা পথ — ২৫-২৭
  সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী
- **ইবাদত ও দোয়া পরস্পর সম্পৃক্ত** — ২৮-৩১
  মিলা পাটোয়ারী
- **ইসলামে খিলাফত** — ৩২
  ফরিদ আহমদ (যুক্তরাজ্য)
- **জ্ঞান জিজ্ঞাসা** — ৩৩
- **সংবাদ** — ৩৪-৩৫
- **কৃষি কথা** — ৩৬-৩৭
- **পাক্ষিক আহমদী গ্রাহক ফরম** — ৩৮

১ম প্রচ্ছদ : ফ্রান্সে নবনির্মিত প্রথম মসজিদ–'মসজিদে মুবারক' এর অভ্যান্তর ভাগের দৃশ্য,
শেষ প্রচ্ছদ : মসজিদ মুবারকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের একাংশের দৃশ্য, আহমদীয়া খিলাফত জুবিলী উপলক্ষ্যে বেলজিয়াম সরকারের স্মারক ডাক টিকেটের ফটো
ডিজাইন : তারেক আহমদ (সবুজ)

কুরআন শরীফ

সূরা হূদ-১১

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ
مُفْتَرَيَاتٍ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾

১৪। অথবা তারা কি (একথা) বলে, 'সে এ (কিতাব) বানিয়ে নিয়েছে?' তুমি বল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর মত দশটি সূরা বানিয়ে আন এবং আলাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য যাকে ডাকতে পার (সাহায্যের জন্য তাকে) ডাক'।

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٥﴾

১৫। অতএব তারা যদি তোমাদের (এ কথায়) সাড়া না দেয়[১৩০৩] তাহলে জেনে রাখ, এ (কিতাব) কেবল আলাহ্‌র জ্ঞানের ভিত্তিতেই অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আরো জেনো, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে (কি হবে না)?

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٦﴾

১৬। পার্থিব জীবন ও এর সৌন্দর্য যারা চায় আমরা এখানেই তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান তাদের দিয়ে দিবো এবং এতে তাদের কোন কম দেয়া হবে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

১৭। এদেরই জন্য পরকালে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং এখানে তারা যেসব শিল্পকর্ম গড়েছে তা নিষ্ফল হবে আর তারা যা করতো তা বিনষ্ট হবে।

১৩০৩। 'লাকুম' সর্বনামটি এস্থলে বহুবচনে ব্যবহৃত করে আল্লাহ্ তাআলা এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, আয়াতে উক্ত চ্যালেঞ্জ শুধু মাত্র নবী করীম (সা.) এর পক্ষ থেকেই ছিল না, বরং তাঁর উম্মতের সর্বযুগের সকল অনুগামীগণকেই অবিশ্বাসীদের প্রতি এই চ্যালেঞ্জের অধিকার দেয়া হয়েছে। এই আয়াত নিশ্চিতভাবে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, সর্বপ্রকার সৌন্দর্যমন্ডিত এবং সকল গুণাবলীপূর্ণ এই মহান ঐশী কিতাব আল্ কুরআন চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে।

হাদীস শরীফ

পুণ্যবতী মহিলা ও স্বামীর অধিকার

কুরআন ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান করো আর আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও (সুরা আল্ ফুরকান : ৭৫)

হাদীস :

আন আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদিন বেইয়াদিহি লা তুওয়াদ্দিল মারআতু হাক্কা রাব্বিহা হাত্তা তুওয়াদ্দি হাক্কা যাওজিহা (ইবনে মাজা)।

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, কোন মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত খোদার হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করে (ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত নবী করীম (সা.) একদিকে পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার শিক্ষা দিয়েছেন অপর দিকে স্ত্রীদের জোরালোভাবে তাগাদা দিয়েছেন তারা যেন স্বামীর হক ও অধিকার আদায় করে। একটি গৃহে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখময় সম্পর্ক বিরাজ করে। হযরত নবী করীম (সা.) অপর এক স্থানে বলেছেন, কারও স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সেই স্ত্রী খোদার ফযলে জান্নাতে যাবে।

কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে জানা যায়, স্ত্রী ঘরের শান্তির কারণ। এমন স্ত্রী, যে ঘরের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে ও চেষ্টায় রত থাকে খোদা তাআলা যেন তার সাহায্যকারী হয়ে যান। এবং এমন গৃহে খোদার তরফ হতে বরকত ও আশিস নাযেল হয়।

আল্লাহ্‌র রসূল কসম খেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে খোদা তাআলার দৃষ্টিতে সে-ই সফলকাম হবে, যে এ জগতে মানবীয় সম্পর্কের প্রতি খেয়াল রাখবে। এমন হৃদয় খোদার প্রতিও ঝুঁকবে। কারণ মানব-প্রেমই খোদা-প্রেমে রূপান্তরিত হয়। আজকের সমাজে সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতার অর্থাৎ বুঝা-পড়ার অভাব। ফলে নৈতিকতার অধ:পতন প্রকট রূপ ধারণ করছে। যে শিক্ষা মানব জীবনে শান্তি বয়ে এনে দিতে পারে আজ আমরা এ শিক্ষা হতে দূরে চলে এসেছি। ঘরের শান্তিই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়। সুতরাং স্ত্রীগণ যদি তাদের স্বামীদের হক আদায় করতে সোচ্চার হয় তবে সন্তান-সন্ততিদের তরবীয়তও উন্নততর হবে। আর এ সবকিছু দোয়ার মাধ্যমে সম্ভব, আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষার ওপর আমল করে সুখের নীড় গড়ে তুলতে পারি (আমীন)।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সহানুভূতি

মানুষের স্বাভাবিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় সহজাত অবস্থা আছে, তা হলো সৃষ্টি জীবের প্রতি সহানুভূতির আবেগ। স্বজাতির পক্ষ সমর্থনে উৎসাহ ও প্রেরণা স্বভাবতই প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পাওয়া যায়। অধিকাংশ মানুষ স্বজাতি- প্রীতির স্বভাবজ উত্তেজনায় বিজাতিগণের ওপর যুলুম করে বসে। দেখলে মনে হয়, তারা অন্যদের মানুষ বলে গণ্য করে না। সুতরাং এই অবস্থাকে নৈতিক গুণ বলা যায় না। এটা কেবল একটা প্রকৃতিদত্ত উত্তেজনা। চিন্তা করলে দেখা যায়, এই স্বভাবজ অবস্থা কাক প্রভৃতি পক্ষীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। একটি কাকের মৃত্যুতে সহস্র সহস্র কাক জমা হয়। কিন্তু এই অভ্যাস মানব চরিত্রে নৈতিকতার রূপ তখনই ধারণ করে, যখন এই সহানুভূতি ন্যায় পরায়ণতা ও সুবিচার সমর্থিত পন্থায় সঠিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ মোতাবেক প্রকাশিত হয়। তখন এটা এক মহান চারিত্রিক গুণ হয়ে যায়। আরবীতে এটা 'মাওয়াসাত' এবং ফারসীতে হামদর্দী নামে পরিচিত। এরই প্রতি আল্লাহ্ জাল্লাহ্ শানুহু কুরআন শরীফে নির্দেশ করছেন ঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۔ (المائدة : ٣)
وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۔ (النساء : ١٠٥)
وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۔ (النساء : ١٠٦)
وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۔ (النساء : ١٠٨)

অর্থাৎ, "স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য শুধু পুণ্য কাজের ব্যাপারে করতে হবে। অত্যাচার ও সীমাতিক্রমের ব্যাপারে কখনও তাদের সাহায্য করবে না (৫ ঃ ৩)। স্বজাতির প্রতি সহানুভূতিতে সদা উৎসাহী থাকবে। ক্লান্ত হবে না (৪ ঃ ১০৫)। বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ সমর্থনে লড়াই করবে না (৪ ঃ ১০৬); যারা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিবৃত্ত হয় না খোদা তাআলা সেই বিশ্বাসঘাতকদের সাথে ভালবাসা রাখেন না" (৪৫ ঃ ১০৮)।

(ইসলামী উসুল কী ফিলোসফি পুস্তকের বাংলা সংস্করণ ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)

আল জব্বার শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

সে যে কোন স্থানে বসবাসকারী আহমদী হোক, হোক ইন্দোনেশিয়ায় বা পাকিস্তানে বা অন্য কোন দেশে, যেখানেই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, সর্বদা স্মরণ রাখুন – তাদের সাহায্যকারী এক পরাক্রমশালী এবং রহীম খোদা রয়েছেন সুতরাং তাঁরই সম্মুখে ঝুঁকুন, দয়া ভিক্ষা করুন তাঁর

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ-اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ- سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ،

(সূরা আল হাশর : ২৪)

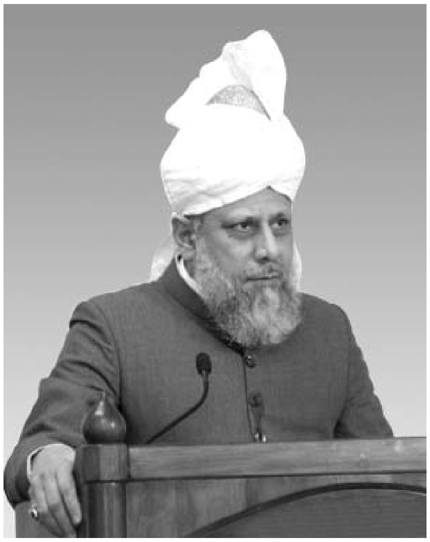

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ১৬ মে ২০০৮ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

এ আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে ঃ তিনি আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই; যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তা দাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল-প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান। তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র।

আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণবাচক নাম জব্বার। আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি ও অনুবাদ পাঠ করেছি, তাতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, জব্বার শব্দ যখনই খোদা তাআলার সত্ত্বা সম্বন্ধে আসে, আর এ শব্দ বান্দার সম্বন্ধে যে অর্থে আসে তা তাথেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন এই অনুবাদ থেকেও এটা স্পষ্ট। ভাষা বিশারদগণ এ শব্দের যে অর্থ করেছেন প্রথমে আমি তা বর্ণনা করছি।

মুফরাদাত ইমাম রাগেব এ লেখা আছে, আল্লাহ্ তাআলার গুনবাচক নাম আল্ আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির, তা আল্লাহ্ তাআলার নাম 'আল্ জাব্বার' আরবীয়দের 'জাবরাতুল ফাকীরা' অর্থাৎ আমি ফকীরকে দান করেছি, সে অনুযায়ী। আর এই নাম "আল জব্বার" এজন্য দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বা এমন যিনি নিজের অগণিত নেয়ামতরাজী থেকে নেয়ামতরাজী নাযিল করেন, নিজ নেয়ামতসমূহ দ্বারা ভূষিত করেন।

এতে পরবর্তীতে লেখা আছে যে 'আল্ জব্বার' মানুষের গুণ হিসেবে ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয় যে এমন অহংকারমূলক দাবী করে, যার যোগ্য সে নয়, মানুষ সম্বন্ধে জব্বার শব্দটি শুধু মাযহাব এর জন্যই ব্যবহৃত হয়।

অতঃপর ভাষা সম্বন্ধীয় কিতাব লিসানুল আরবে লেখা আছে, 'আল জব্বার' আল্লাহ্ তাআলার একটি সিফত। অর্থাৎ

নিজ সৃষ্টিকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনাকারী। এখানে এটাও পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, এতে জোর জবরদস্তি নেই, আল্লাহ্ তাআলা ভাল মন্দ বান্দার সামনে রেখে দিয়েছেন, যদি নেকীর ওপর চলো তবে নেকীর পুরস্কার পাবে আর যদি মন্দকর্ম কর, তবে প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী মন্দকর্মের শাস্তি পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার রহমত সম্বন্ধীয় গুণবাচক একটি নামও রয়েছে, যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, আমার রহমত সকলকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, প্রত্যেক জিনিষকে ছেয়ে আছে। এ অনুযায়ী তিনি মালিক। যেমন ইচ্ছা তেমন আচরণ করেন, রহমত দ্বারা ক্ষমাও করে থাকেন।

মোটকথা এই অভিধানে পরবর্তীতে "আল জব্বার" এর এক অর্থ লিখেছে যে, এটি আল্লাহ্ তাআলার ঐ সিফত যে পর্যন্ত বুদ্ধির শক্তি পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত মানুষের ধীশক্তি পৌঁছতে পারে না। অতঃপর লেখা আছে সৃষ্টিকূল থেকে উচ্চ পর্যায়ের সফলকাম সত্তাকে আল্ জব্বার বলে। মানুষ সম্বন্ধে লিখা আছে যে, সেই প্রবল অহংকারী ব্যক্তি যে নিজ করায়ত্ত আওতার মধ্যে অন্য কারো অধিকারের পরোয়া করে না তাকেও 'জব্বার' বলা হয়।

লেহ্ইয়ানী বলেন 'জাব্বার' ঐ ব্যক্তি যে অহংকারবশতঃ আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত থেকে বিরত থাকে। ইবাদত করে না এবং তার মধ্যে অহংকার পাওয়া যায়।

"ক্বালবুন জাব্বার" এর অর্থ এমন হৃদয় যাতে রহম নেই। এমন হৃদয় যা অহংকার বশতঃ উপদেশ মানে না। "রাজুলুন জাব্বার" প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে জব্বার বলে যে জোরপূর্বক নিজের কথা মান্য করায় যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **ওয়ামা আনতা আলাইহিম বিজাব্বার** (সূরা ক্বাফ ঃ ৪৬) অর্থাৎ তুমি তাদের ওপর শাসক নও, যাতে তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য কর। অতঃপর প্রত্যেক ঝগড়াটে ব্যক্তি, যে অন্যায় ভাবে লড়াই – ঝগড়া করে তাকেও জব্বার বলা হয়। আল জব্বার মহান, আর উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিকেও বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, 'আল জাব্বার' তাকে বলা হয় যে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে চলে যেতে থাকে আর তার সম্মান ও মর্যাদায় ঘাটতি হয় না ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বিভিন্ন অভিধান থেকে এ শব্দের অর্থ নিয়েছেন। তিনি (রা.) লিখেছেন, 'আল জাব্বার' আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণবাচক নাম আর এর অর্থ লোকদের প্রয়োজন পূর্ণকারী। কিন্তু যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য জব্বার শব্দটি ব্যবহার হয়, তখন এর অর্থ অবাধ্য আইন কানুন ভঙ্গকারী । (তফসীরে কবীর : ৭ম খন্ড, তফসীর সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ২০ পৃষ্ঠা ঃ ৪৮৫)

অপর এক স্থানে তিনি (রা.) লিখেছেন, জাব্বার এর অর্থ অন্যকে নীচু করে নিজেকে উচ্চকারী।

আরেক জায়গায় তিনি (রা.) লিখেছেন, জব্বার শব্দটি খোদা তাআলার একটি গুণবাচক নাম। অর্থাৎ সংশোধনকারী। আর সকল বিদ্রোহী এবং কথা অমান্যকারীদেরও জব্বার বলা হয়। (তফসীর কবীর, তৃতীয় খন্ড, তফসীরাধীন আয়াত সূরা হুদ- ৬০ পৃষ্ঠা ২১০)

অতঃপর অন্যত্র তিনি (রা.) লিখেছেন, যেখানে এর অর্থ সংশোধন করা সেখানে কারো ইচ্ছার বিপক্ষে তার ওপর যুলুম করে জোরপূর্বক কাজ আদায় করা অর্থেও আসে। সুতরাং একটি অর্থ এমন যাতে নেকী ও সংশোধন পাওয়া যায়। (তফসীরে কবীর : ৫ম খন্ড, তফসীর সূরা মরিয়ম, আয়াত ১৫, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অর্থ করেছেন "ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়াকে সঠিক পথে আনয়নকারী"।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জলসা সালানায় কদীরে ইলাহী বিষয়ে একটি বক্তৃতায় খোদা তাআলার সত্তায় (জাব্বার) সম্বন্ধে কিছু লোকের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরআন করীম থেকে জানা যায় খোদা তাআলা জাব্বার। এর অর্থ সংশোধনকারী আর বলা হয় জাবারাহু (জোরপূর্বক কাজ করায়) অথচ এটি কোন অবস্থায়ই সঠিক নয়। আরবীতে জাবরা অর্থ ভাঙ্গা হাড়কে ঠিকঠাক করা আর যখন এ শব্দ খোদা তাআলার সাথে যুক্ত হয় তখন এর অর্থ বান্দাদের মন্দ কর্ম সংশোধনকারী আর এর অপর অর্থ অন্যের অধিকার খর্ব করে নিজ সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী। কিন্তু এ অর্থ শুধু তখনই করা হয় যখন বান্দাদের সম্বন্ধে ব্যবহার হয়। খোদা তাআলা সম্বন্ধে এ অর্থে ব্যবহার হয় না আর এটা সম্ভবও নয় কেননা সবকিছুই খোদা তাআলার– এটা বলা সম্ভবই নয় যে অন্যের অধিকার খর্ব করে তিনি নিজের সম্মান

প্রতিষ্ঠিত করেন। (তকদীরে ইলাহী, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫৯) এটি তকদীরে ইলাহীর বিষয়। প্রকৃত বিষয় এ কিতাব পাঠেই অনুধাবন করা যায়। মোটকথা এ শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ ব্যাখ্যা করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই আয়াতে (যা আমি তেলাওয়াত করেছি) বর্ণিত গুণবাচক নাম সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "আল মালিকুল কুদ্দুসু" অর্থাৎ সেই বাদশাহ্ খোদা যিনি সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। এটা স্পষ্ট যে মানুষের বাদশাহী ত্রুটি মুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন রাজ্যের সকল প্রজা রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যের দিকে পালিয়ে যায়, তবে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। অথবা উদাহরণস্বরূপ যদি সকল প্রজাসাধারণ তার সাথে বাক বিতন্ডা শুরু করে যে, তোমার মাঝে আমাদের চাইতে এমন কি বেশী যোগ্যতা আছে, তবে সে নিজের কি যোগ্যতা প্রমাণ করবে? সুতরাং খোদা তাআলার বাদশাহী এমন নয়। তিনি এক ফুৎকারে সমগ্র রাজ্য ধ্বংস করে নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। যদি তিনি এমন খালেক ও কাদের না হতেন, তবে যুলুম নির্যাতন ব্যতীত তার রাজত্ব চলতে পারত না। কেননা তিনি দুনিয়াকে একবার ক্ষমা ও মুক্তি দান করে পুনরায় আরেক দুনিয়া কিভাবে আনতেন। মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদেরকে কি দুনিয়াতে প্রেরণের জন্য পুনরায় ধৃত করতেন? ....

সুতরাং এ অবস্থায় তাঁর প্রভুত্বে বিভেদ সৃষ্টি হতো আর দুনিয়ার বাদশাহদের ন্যায় কলঙ্কময় বাদশাহ্ হয়ে যেতেন, যে দুনিয়ার আইন বানায়, কথায় কথায় বিগড়ে যায় আর নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে যখন দেখে যে জুলুম ব্যতীত আর উপায় নেই, তখন জুলুমকে বৈধ করে। যেমন রাজকীয় আইনে এটা বৈধ যে, একটি জাহাজকে বাঁচানোর জন্য একটি নৌকার আরোহীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া যায় আর ধ্বংস করা যায়। কিন্তু খোদা তাআলার তো এই বাধ্য বাধকতা থাকা সমীচীন নয়। সুতরাং যদি খোদা পূর্ণ শক্তিমান আর শূন্য থেকে সৃষ্টিকারী না হতেন তবে হয় তিনি দূর্বল সম্রাটদের ন্যায় অলৌকিক শক্তির স্থলে জুলুম এর মাধ্যমে কাজ করতেন অথবা আদেল হয়ে খোদাত্বকেই বিদায় জানাতেন। বরং খোদার জাহাজ সমস্ত অলৌকিক শক্তিমত্তাসহ সত্য ও ন্যায় বিচারের ওপর চলছে।

অতঃপর বলেছেন, 'আসসালামু' অর্থাৎ সেই খোদা যিনি সকল দোষত্রুটি আর বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট এবং কাঠিন্য থেকে নিরাপদ বরং নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদানকারী। এর অর্থও সুস্পষ্ট কেননা যদি তিনি নিজেই বিপদে নিপতিত থাকেন, লোকদের হাতে মারা যান আর নিজের ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হন তবে এই খারাপ নমুনা দেখে কিভাবে হৃদয়সমূহ সান্ত্বনা পেত যে এমন খোদা আমাদেরকে নিশ্চয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত করবেন।

অতঃপর বলেছেন, খোদা শান্তিপ্রদানকারী আর নিজের উৎকর্ষ আর তৌহীদের (একত্বের) সত্যতা প্রতিষ্ঠাকারী। আর এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, সত্য খোদা মান্যকারী কোন মজলিসে লাঞ্ছিত হতে পারে না, আর না খোদার সামনে লজ্জিত হবে। কেননা তার কাছে শক্তিশালী দলিল প্রমাণ থাকে। কিন্তু মিথ্যা খোদার মান্যকারীরা খুব বিপদে থাকে। তারা দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের পরিবর্তে বৃথা কথাবার্তাকে রহস্য বলে চালিয়ে দেয়, যাতে তারা হাসির পাত্র না হয় আর প্রমাণিত ভুলগুলোকে লুকাতে চায়। অতঃপর বলেছেন, **"আল মুহায়মিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির"** অর্থাৎ তিনি সকলের রক্ষক আর সকলের ওপর বিজয়ী আর পথভ্রষ্টদের সংশাধনকারী আর তার সত্তা খুবই প্রাচুর্যশালী।" (ইসলামী উসুল কী ফিলসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৫)

সুতরাং তিনিই হচ্ছেন সেই খোদা যার সম্বন্ধে এ আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায় যা আমি তেলাওয়াত করেছি। এতে আল্লাহ্ তাআলার ঐ সকল গুণ বর্ণিত হয়েছে যা বান্দাকে তার নিকটে নিয়ে আসে। আল্লাহ্ তাআলার রহমের উত্তরাধিকারী বানায়। তিনি বাদশাহ্, সকল ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র। প্রত্যেক দুর্বলতা থেকে পবিত্র। প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে পবিত্র। তাঁর শক্তি সকল ধরণের শান্তি বরং পূর্ণ শান্তির উৎসস্থল। বান্দাদের সকল ধরণের বিপদ থেকে সুরক্ষাকারী আর সকলের ওপর তত্ত্বাবধায়ক। সকল শক্তির অধিকারী এবং বিজয়ী। প্রত্যেক ভাঙ্গা কাজকে পূর্ণতাদানকারী আর প্রত্যেক ক্ষতি পূরণকারী। তিনি প্রত্যেক প্রয়োজন এর উর্ধ্বে আর সকলের প্রয়োজন পূর্ণকারী।

সুতরাং এই শক্তিশালী খোদার সম্বন্ধে জব্বার এর অর্থ করা সম্ভব নয় যা সাধারণ ভাবে করা হয় বা বান্দার সম্বন্ধে করা হয়ে থাকে। এটা তার ওপর প্রযোজ্য হতেই পারে না। কেননা সাময়িক শক্তি বা সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রের

তো ঐ সকল লোকদের প্রয়োজন আছে যারা ক্ষণস্থায়ী লোক। খোদা তো চিরস্থায়ী, চিরকাল শক্তিশালী আর সকল শক্তির উৎস। আর তার বিপরীতে, যেমন আমি পূর্বে বলেছি যখন বান্দার দিকে এই গুণবাচক নাম সম্পৃক্ত হয়, তখন তার অর্থ হয় দয়া-মায়াহীন, অহংকার বশতঃ নসিহত অগ্রাহ্যকারী, স্বেচ্ছাচারী আর ঝগড়াকারী।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে যেখানেই জব্বার শব্দ বান্দাদের জন্য ব্যবহার করেছেন, সেখানে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এখন আমি কিছু আয়াত পেশ করছি যাতে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। একজন তফসীর কারক মানুষ সম্বন্ধে জব্বার এর নিম্নরূপ শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত শাসনকর্তা হওয়া। এর দলিলরূপে তিনি এ আয়াতটি উপস্থাপন করেন **'ওয়ামা আনতা আলাইহিম বিজাব্বার'** (সূরা ক্বাফ ঃ ৪৬ আয়াত) । অর্থাৎ তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও।

দ্বিতীয়ত বিশাল প্রকৃতিধর।

اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ

(আল মায়েদা ঃ ২৩)

নিশ্চয় সেখানে এক দুর্ধর্ষ শক্তিধর জাতি রয়েছে।

وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا

(সূরা মরিয়ম ঃ ৩৩)

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতকে অস্বীকারকারী।

আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নাই অত্যধিক লড়াইকারী যেমন,

بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

(আশ্ শুআরা ঃ ১৩১)

অর্থাৎ শক্তভাবে ধৃতকারী

اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ

(আল্ কাসাস ঃ ২০)

সুতরাং শাসক হওয়া সম্পর্কে যে আয়াতের দৃষ্টান্ত আমি প্রদান করেছি, এটি সূরা কাহ্ফ এর ৪৬ নং আয়াত। পুরো আয়াতটি হচ্ছে

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ

(সূরা ক্বাফ ঃ ৪৬ নং আয়াত)।

তারা যা বলে আমরা তা স্ববিশেষ অবগত আছি, তুমি তাদের ওপর (কোন ক্রমেই) শক্তি প্রয়োগকারী নও, অতএব তুমি কুরআন দ্বারা তাকে উপদেশ দাও যে আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।

সুতরাং আঁ হযরত (সা.)কে মান্যকারীদের প্রতিও এই নির্দেশ যে, তোমাদের কাজ সংবাদ পৌঁছে দেয়া। বলপূর্বক কারো সংশোধন হতে পারে না, আল্লাহ্ তাআলা যখন নিজের প্রিয়দের স্বপক্ষে নিদর্শন প্রদর্শন করেন, তখন অস্বীকারকারীদের খেয়াল আসে যে আমাদের পাপের দরুন কিছু শাস্তি পাচ্ছি কিন্তু তবুও কিছু দুর্ভাগা এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না।

পাকিস্তানে বিভিন্ন বিপদাপদের পর লেখকরা সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি করেছে যে মনে হচ্ছে আমাদের ভুলত্রুটির পরিণামে এসব কিছু হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার আওয়াজের প্রতি তারা কান দেয় না, নিজেদের চোখ খুলে দেখে না। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এই নির্দেশ রয়েছে যে তোমাদের কাজ শুধু সতর্ক করা আর সংবাদ পৌঁছানো। সুতরাং মানবিক সহমর্মিতা ও আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশানুযায়ী আমাদের কাজ দুনিয়াকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করতে থাকা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার এই ওয়াদা রয়েছে যে, আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব আর একে আমরা প্রতিদিন পূর্ণ হতে দেখছি। কিন্তু এর এই অর্থও রয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে মান্যকারীদের কাজ হচ্ছে এই পয়গামকে পৌঁছাতে থাকা। তার ফল প্রদান করা আমাদের কাজ। এর উপায় উপকরণ তৈরী করা আমার কাজ। তা ব্যবহার করা তোমাদের কাজ। তার ফল বের করা, হৃদয়সমূহ জয় করা খোদা তাআলার কাজ। সুতরাং আমাদের দায়িত্বে যে কাজ রয়েছে, তা আমাদের করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে তার সৌভাগ্য দান করুন।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা হুদে অবাধ্য ও অস্বীকারকারীদের এই দলের মধ্যে গণ্য করেছেন। তারা জব্বার হয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেছেন,

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ

وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

(সূরা হুদ ঃ ৬০)

অর্থাৎ- এবং এই ছিল আদ জাতি যারা

তাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রসূলগণের অবাধ্যতা করেছিল এবং প্রত্যেকে (সত্যের) উদ্যত শত্রুর আদেশের অনুসরণ করেছিল।

এখানেও আল্লাহ্ তাআলা এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যাতে আদ জাতির পুণ্যের পথ পরিত্যাগ করা সাব্যস্ত হয়। রসূল এর অবাধ্যতা করে আর পার্থিব উচ্চ পদ ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সব কিছু মনে করে যারা আল্লাহ্ তাআলার নিকট তারা অবাধ্য লোক বলে গণ্য হয়েছে। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, ঐ নির্বোধরা সেই অকৃতজ্ঞতার কারণে শাস্তি লাভ করে আর তারা যাদের আনুগত্য করতে থাকে আর যাদেরকে তারা প্রতাপশালী আর উচ্চ মর্যাদা দানকারী আর হিফাযতকারী মনে করতে থাকে তারা আল্লাহ্ তাআলার বিপরীতে তাদের কোন কাজেই আসল না। সুতরাং পূর্ববর্তী জাতিকে এই শাস্তি প্রদান করে আল্লাহ্ তাআলা যে শিক্ষা প্রদান করেছেন তা ভবিষ্যতেও এই জাতিসমূহকে স্মরণ রাখতে হবে।

অতঃপর সূরা শোআরায় আল্লাহ্ তাআলা বর্ণনা করেছেন,

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

(আশ শোআরা ঃ ১৩১)।

আর যখন তোমরা কাউকে ধৃত কর তখন নিষ্ঠুরদের ন্যায় ধৃত কর।

এখানে পুনরায় সেই আদ জাতির উল্লেখ রয়েছে যে কিভাবে বিজয়ীরূপে তোমরা এই সভ্যতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা কর। যে জাতিকে পরাভূত কর, তাদেরকে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা কর আর নিজের বীরত্ব আর শক্তি প্রদর্শন কর। নিজের সামরিক শক্তি ও ক্ষমতার কারণে চাও যেন সকল জাতি তোমাদের অধীন হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল তাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এ আচরণ পছন্দ করেন না। খোদাকে ভয় কর আর নিজেদের সংশোধন কর।

আমরা তো জানি যে অবশেষে বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। কেননা আমাদের প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন। সেই খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেছেন যে, আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সঙ্গে আছি।

বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই যে কিছু বড় পরাশক্তি এই নীতির ওপর চলছে। যদিও রাজনৈতিক কারণে কখনো কখনো সাহায্য সহযোগিতার নামে দখল করা হয়, কিন্তু বড়াই ও অহংকার পরিষ্কার বলে দেয় যে, হৃদয়ে কিছু আছে আর প্রকাশ করছে ভিন্ন রকম। প্রকৃত উদ্দেশ্য দখল এবং কর্তৃত্বাধীনে রাখা। আসল উদ্দেশ্য নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর তাদেরকে নিজেদের পদানত করা। অতঃপর জোর পূর্বক তাদেরকে পাকড়াও করে সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শাস্তিও প্রদান করা হয়। প্রথমে তো কিছু একটা বলা হয় অতঃপর ঐ ধৃত করার মাধ্যমেই ফাঁসানো হয় আর শাস্তি প্রদান করা হয়। আজকাল কিছু রাষ্ট্র আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু ইসলামী রাষ্ট্র বলে কথিত রাষ্ট্র যাদের কুরআন করীমের শিক্ষার ওপর চিন্তা করে নিজেদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু তার পরিবর্তে তারা অবাধ্যতা ও জুলুম নির্যাতনে লিপ্ত। প্রথমে তো পাকিস্তানে নির্যাতন হত। এরপর বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিষ্পাপ আহমদীদের ওপর নির্যাতন শুরু করা হয়।

কিছু দিন ধরে ইন্দোনেশিয়াতেও নির্যাতন হচ্ছে আর তারা মনে করে যে তারা ক্ষমতাধর সুতরাং যেভাবে ইচ্ছা আহমদীদের সাথে আচরণ করবে। তাদেরকে শাস্তি দিবে, তাদের নারী ও বাচ্চাদের ওপর জুলুম করবে, তাদের ধনসম্পদ জ্বালিয়ে দিবে আর এটি শুধু এজন্য যে, সেখানকার সরকারের সাথে এখন মোল্লারাও শামিল আছে। আর রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সদস্য যারা আছেন বা যে সরকার আছে তারা রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু এ কারণে যে ঐ মোল্লাদের কথা না মানলে আমাদের ক্ষমতা না আবার হাত ছাড়া হয়ে যায়। যারা সর্বদা ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, নিজেদেরকে ক্ষমতাধর মনে করে আর তারা এটা বুঝে না যে তাদের এ কাজ তাদেরকে ঐ

অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত করছে যারা বান্দার হক আদায় করে না আর আল্লাহ্ তাআলার হুকুমও ভঙ্গ করছে আর তারা জানে না যে আল্লাহ্ তাআলা যখন এমন অত্যাচারী ও অবাধ্যদের কথা উল্লেখ করেন, যারা আল্লাহ্‌র রসূলের শত্রুতা করার কারণে তাকে বা তার জাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টা করে। সুতরাং এমন ধরনের লোকদের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **'ইন্না রাব্বাকা লাহুয়াল আযীযুর রাহিম' (আশ শোআরা-১০)।**

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার প্রভু মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়াময়। সুতরাং আমরা তো জানি যে অবশেষে বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। কেননা আমাদের প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন। সেই খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেছেন যে, আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সঙ্গে আছি।

সুতরাং আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, ইনশাআল্লাহ্ বিজয় অবশেষে আমাদেরই হবে আর এ সকল লোক যারা নিজেদের ধারণায় নিজেদের শক্তিশালী মনে করে, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এরাও শীঘ্রই তাদের পরিণাম লাভ করবে। এরা মনে করে আহমদীদের বিরোধিতার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তারা জানে না যে শীঘ্রই তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে আর তারা উচ্চ মর্যাদার পরিবর্তে অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে আর তারা সেদিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

সুতরাং আহমদীরা যে যেখানে আছেন, চাহে তা ইন্দোনেশিয়া হোক বা পাকিস্তান বা অন্য কোন দেশ, যেখানে যেখানে তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, সর্বদা স্মরণ রাখুন যে পরাক্রমশালী ও দয়াময় খোদা তাদের সাহায্যকারীরূপে আছেন। সুতরাং তাঁর সম্মুখে ঝুকুন, তাঁর নিকট দয়া ভিক্ষা চান। সেই খোদা যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে

এরা
মনে করে আহমদীদের বিরোধিতার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তারা জানে না যে শীঘ্রই তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে আর তারা উচ্চ মর্যাদার পরিবর্তে অন্ধকার অতল গহ্বরে নিপতিত হবে আর তারা সেদিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

জ্ঞাত, তাঁর দৃষ্টিতে যদি এ সকল লোক সংশোধনের অযোগ্য হয়, তবে আমাদেরকেও তাদের থেকে মুক্তি দিন আর ঐ নির্বোধদেরকেও, ঐ দূর্বলদেরকেও মুক্তি দিন যারা তাদের কথা শুনে নিজেদের দুনিয়াও বরবাদ করছে আর নিজেদের পরকালও বরবাদ করছে। সুতরাং এমন লোকদের ওপর রহমের জন্যও আবশ্যক যে আমরা আমাদের দয়াময় খোদার নিকট দোয়া করি যে এই জালেমদের থেকে এই দুনিয়াকে যেন সুরক্ষিত রাখেন। যদি খোদা তাআলা এই জালেমদেরকে ঐ দলে শামিল করে নিয়ে থাকেন, যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন

'কাযালিকা ইয়াত বাউল্লাহু আলা কুল্লি ক্বালবি মুতাকব্বিরীন জাব্বারীন'

(সূরা আল্ মো'মেন ঃ ৩৬)

অর্থাৎ এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা সকল অহংকারী আর জালেমদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। সুতরাং বাকী দুনিয়ার মুক্তির জন্যও আহমদীদের অনেক বেশী দোয়া করা প্রয়োজন আর পয়গাম পৌঁছানো দরকার। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে সেই সৌভাগ্য দান করুন।

ইন্দোনেশিয়ার আহমদীদেরকেও আমি বলতে চাই, প্রথমে তো কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার দাবীদার শুধু পাকিস্তানী আহমদীরাই হচ্ছিল যে আগুন লাগানো হচ্ছিল আর পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ বসে বসে তামাশা দেখতো এখন ইন্দোনেশিয়াতেও ধীরে ধীরে এমন ঘটনা ঘটছে যা আমরা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছি। সুতরাং এটা সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যা কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, তারা আগুন লাগাবে আর দেখবে। সুতরাং নিজেদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করুন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই জালেমদের এ যুলুম তাদের ওপরেই নিপতিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে দোয়া করার সৌভাগ্য দিন আর ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন। (আমীন)

অনুবাদ : **মাওলানা জহির উদ্দীন আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আমাদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তাআলার একটি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে আহমদীয়া জামাআতের কেবলমাত্র একটি জুবিলী নয় বরং এমন আহমদী বহু রয়েছে যাদের (আল্লাহ্ তাআলা দু'টি খিলাফত জুবিলী দেখিয়েছেন) আহমদীয়া জামাআতের ইতোমধ্যে প্রায় ১২০ বছর পূর্ণতাকালে জামাআতের লাগাতার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি জুবিলী দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আর এ কারণে প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্ তাআলার সমীপে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ৩০ মে ২০০৮ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

এ সপ্তাহে-ই কিছুদিন আগে ২৭ মে তারিখ আমরা আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও অনুগ্রহের সাথে খিলাফত দিবস উদযাপন করেছি। আমি ইতোপূর্বেও আমার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি, এ বছর খিলাফত দিবসের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। এটি এমন এক খিলাফত দিবস যা সাধারণত একটি মানুষের জীবনে একবারই এসে থাকে অথবা যদি কেউ অনেক দীর্ঘায়ু লাভ করে তবে তার দীর্ঘ জীবনে সে আরও একবার এটা পেতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা কারও প্রতি যদি বিশেষ অনুগ্রহ করেন এবং সে সুস্থভাবে স্বজ্ঞানে দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং তার শারীরিক সুস্থতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথ থাকে এবং চরম বার্ধক্যে উপনীত না হয়। যাই হোক, আমাদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তাআলার একটি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে আহমদীয়া জামাআতের কেবলমাত্র একটি জুবিলী নয় বরং বহু এমন আহমদী রয়েছে যাদের (আল্লাহ্ তাআলা দু'টি খিলাফত জুবিলী দেখিয়েছেন) আহমদীয়া জামাআতের ইতোমধ্যে প্রায় ১২০ বছর পূর্তিতে জামাআতের লাগাতার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি জুবিলী দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আর এ কারণে প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্ তাআলার সমীপে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে। আহমদীয়া জামাআতের ভিত্তি স্থাপনের প্রথম শতাব্দী ১৯৮৯-এ অর্থাৎ আজ থেকে ১৯ বছর পূর্বে আমরা উদযাপন করেছি। আর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জামাআতও তা উদযাপন করেছে। এ মুহূর্তে অনেক শিশু এমনও আছে বা এমনও অনেক শিশু জন্মগ্রহণ করবে যারা ১৯৮৯-এর মাঝে জন্ম লাভ করেনি, এর পর জন্ম নিয়েছে অথবা অপ্রকৃতিস্থ অথবা ১৯৮৯-এর পর জামাআতে শামিল হয়েছে তাদের তো এ জুবিলী সম্বন্ধে ধারণা নেই কিন্তু যারা এ জুবিলী সজ্ঞানে উদযাপন করেছে অথবা অবলোকন করেছে অবশ্যই তারা এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করছে অথবা অতিবাহিত করেছে অথবা করবে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে যেখানেই জামাআত প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকে তাদের প্রোগ্রাম নির্ধারণ করেছে বা করছে। M.T.A-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রোগ্রামেও তারা অংশগ্রহণ করছে।

স্থানীয় জামাআতগুলোর প্রোগ্রাম নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী সম্ভবত সমস্ত বছর

উদযাপিত হবে। কিন্তু এখানের কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম সেটাই ছিলো যখন Excel সেন্টারে কেন্দ্রীয় জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেখানে আনুমানিক ১৮/১৯ হাজার লোক সমাগম হয়েছিল। পৃথিবরি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্বও হয়েছে আর কাদিয়ান এবং রাবওয়াহ্, উভয় বসতিতে জলসা শ্রবণকারীদের দৃশ্যও M.T.A-এর মাধ্যমে পৃথিবীবাসীকে দেখানো হয়েছে। এটাও লোকদের হৃদয়ে এক বিশেষ অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে জামাআতের প্রিয়গণ এমনকি মহিলাদেরও বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং ফ্যাক্স আসা শুরু হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলার ফজল ও এহসানে আল্লাহ্ তাআলা এক বিশেষ অবস্থার মাঝে সে দিন, না কেবল ঐ জলসায় আগমণকারী সামনে উপস্থিত লোকদেরকে প্রবেশ করিয়েছিল বরং জগতের প্রত্যেক কোণে কোণে যেখানেই আহমদী এই জলসা শ্রবণ করছিল তা জামাতী ব্যবস্থাপনায় হোক বা ব্যক্তিগত ভাবে নিজ ঘরে বসে অথবা নিজ খান্দানের মাঝে, যে-ই এ কার্যক্রম শুনছিল এবং দেখছিল, যার-ই সুযোগ হচ্ছিল সকলে ঐ বিশেষ মহল এবং ঐ বিশেষ অবস্থা থেকে অংশলাভ করেছিল। যদিও আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর সকল বসবাসকারী প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতির আহমদীদেরকে এমন একটি অভিজ্ঞতার সাথে অতিক্রম করিয়েছে যা এক সুতায় গাঁথা। এটি একটি ভিন্ন ধরনের এবং রূহানী অভিজ্ঞতা ছিল আর এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার এবং তাঁর সাথে আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকারের পূর্ণ হবার এক মহাপ্রকাশ ছিল যা আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি এবং অপরাপরও প্রত্যক্ষ করেছে।

২৭-মের এই দিন, যে দিন আহমদীয়া খিলাফতের শত বর্ষ পূর্তি হয়েছে। আমাদের নিজেদেরকে এবং অপরাপরকেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজ সাহায্য ও সহযোগিতা দেখিয়ে দিয়েছে। সেখানে উপস্থিত আহমদী সকল পুরুষ ও মহিলা এবং বাচ্চারা সকলে ঐ অবস্থার মাঝে রিবাজ করছিল, যেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে সে-ই আমাকে একথা বলেছে যে, এই উৎসব আমাদের ঈমানকে সতেজ করেছে। আমি এ-ও বলেছি পৃথিবীর সকল আহমদীদের অবস্থা অনুরূপ ছিল। প্রত্যেক স্থানে খিলাফতের সাথে অসীম ভালবাসা এবং নিজ ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টির প্রকাশ ঘটছিল। এক ব্যক্তি লিখেছেন, 'আমার মনে হচ্ছিল, আমি আজ নতুন ভাবে আহমদী হচ্ছি। অনেক এমন ছিলেন যারা কতক সন্দেহে নিপতিত ছিলেন, তারা পঞ্চম খিলাফতের বয়আত ঠিক-ই করেছিলেন কিন্তু তাদের হৃদয় এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না, তারা লিখেছেন, আমরা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এস্তেগফার করেছি এবং আপনার কাছে অঙ্গীকারও করছি, আল্লাহ্ তাআলা এ উৎসবের বরকতে আমাদের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করেছেন, বরং বলা উচিত, ধুয়ে মুছে চক্চকে করে দিয়েছেন।" এর পর আমরা খিলাফতে আহমদীয়ার জন্য মন থেকে সকল কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকবো আর নিজ বংশধরদের মাঝেও ঐ রূহ ফুৎকার করার চেষ্টা করবো যা সর্বদা এই খিলাফত থেকে বরকত মন্ডিত হতে থাকবে।'

এক ব্যক্তি লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তির মাধ্যমে মৃত জীবিত হতে সক্ষম হয় তবে তা এই বক্তৃতা অর্থাৎ আপনার ভাষণ-ই ছিল। আল্লাহ্ করুন, এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর আহমদীদের মাঝে প্রকৃত-ই এক বিপ্লব যেন সাধিত হয় এবং তা যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমরা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে নিজেদের হৃদয়ের পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে যেন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকি। সে সময় Excel সেন্টারের আশেপাশের লোক এমনকি সেখানে অবস্থানকারী লোকেরা অবাক হয়ে আগত সদস্যদেরকে একত্রিত হতে দেখছিল। আর এই অভূতপূর্ব অবস্থা দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিল যে – এরা কারা ! সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে মুসলমানরা সুশৃঙ্খল (Disciplined) নয়। অদ্ভুত তাদের ধারণা। পশ্চিমাদের মাঝে এমন-ই প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে মুহূর্তে তাদের এ অবস্থা অন্যরকম ছিল। আর তারা দেখছিল, এরা অদ্ভূত রকমের মানুষ, মুসলমানতো ঠিক-ই কিন্তু তাদের মাঝে এক অদ্ভুত রকমের শৃঙ্খলা রয়েছে। অধিকাংশরা এশিয়াবাসী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির লোক তাদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত, আর প্রত্যেক শিশু, যুবক, পুরুষ-মহিলা এবং বিভিন্ন জাতির গতিপথ একইদিকে। খিলাফতের সাথে ভালবাসা বয়:জেষ্ঠ ব্যক্তি এবং যুবকদের হৃদয় থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল এমনকি তাদের চেহারা বরং তাদের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল। এক্সেল সেন্টারের নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মরত এক মহিলা কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে আমাদের মহিলাদেরকে বলছিল, আমি আজ যে দৃশ্য দেখলাম তা আমার জীবনের প্রথম। নিঃসন্দেহে এটি এক নতুন অভিজ্ঞতা আর এটা দেখে আমি আজ বুঝতে পেরেছি ইসলাম কী! এ দৃশ্য দেখেই-তো আমি মুসলমান হতে চাইছি। যাই হোক, জাগতিক অবস্থা এ লোকদের মাঝে অতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং এরা এর প্রকাশও ঘটায় কিন্তু দোয়া করা দরকার এ মহিলা বা এ ধরনের লোকদের হৃদয়ে এ দৃশ্য যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধনের 'মাধ্যম' এ রূপ

নেয়। জগত যেন নিজ সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এবং সকলে যেন রসূল করীম (সা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত হয়। যে যেভাবেই বোঝে বা যে কথার মাধ্যমে বোঝে। সুতরাং খিলাফত জুবিলীর এ জলসা, যার মাঝে নিজেদের লোক এবং অপরাপরও একতার এক অটুট বন্ধন নতুন মর্যাদায় প্রত্যক্ষ করেছে তা আজ একমাত্র মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাআতের বৈশিষ্ট্য। আজ, এই অরাজকতার যুগে আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার অনুযায়ী একতাবদ্ধ কোন জামাআত যদি থেকে থাকে তা কেবল মসীহ্ মাহদী (আ.)-এর জামাআত। বাকী সব দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিভক্ত আর এভাবেই তারা থাকবে যতদিন পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্ তাআলার 'এই পুরস্কার' এর সম্মান করে। যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত রসূল করীম (সা.)-এর উক্ত নির্দেশকে মান্য না করবে "যখন আমার মসীহ্ ও মাহদী প্রকাশিত হবে তখন তোমরা তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে।" আজ মুসলমানদের অবস্থা উক্ত উক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব। বিধর্মীদের খোদা তাআলা থেকে দূরে থাকা প্রমাণ বহন করে, তারা শয়তানের কোলে বসে আছে। নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে ভূলে বসেছে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে তারা ভুলে বসেছে। এমনকি তাদের এতটুকুও জ্ঞান নেই যে তাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কী!

সুতরাং আজ যদি কোন জামাআত থেকে থাকে তা এই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাআত, যারা যারা এ উদ্দেশ্যকে জানে এবং এ উদ্দেশ্যকে অর্জনের লক্ষ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে। আজ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাআত-ই এ শক্ত হাতলকে কে ধরে রেখেছে যার মাধ্যমে এর সঠিক পথের অনুবর্তিতা সম্ভব। আহমদীরা এমন দৃঢ় ঐ হাতল ধরে আছে যা দ্বিখন্ডিত হবে না আর এর জামানত স্বয়ং খোদা তাআলা। আল্লাহ্ তাআলা আজ নিজ ফজল দ্বারা আহমদীদেরকে এ পাত্রের আংটাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়ে রেখেছেন যার মাঝে মসীহ্ মাহদীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা সতেজ আধ্যাত্মিক পানীয় ভরে দিয়েছেন।

জীবন দানকারী পানীয় যা পান না করার ফলে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ থেকে উচ্চ মর্যাদা প্রত্যেক মু'মিন সফর করতে সক্ষম আর এই দৃঢ় আংটাকে ধরে রাখার আরেকটি উদ্দেশ্য হল একে ধারনকারী

আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি যেন শুকরিয়া জ্ঞাপন-এর উচ্ছাস আর আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহ কখনো নিঃশেষ না হয়।

প্রত্যেকের ঈমান সর্বদা নিরাপত্তায় পর্যবসিত হবে। মসীহ্ মাহদীর দাসত্বের ফলে তার সাথে বয়আতের অঙ্গীকারকারীরা এর উপর আমল করার প্রচেষ্টাকারীরা সর্বদা নিজেদের ঈমানকে উন্নত করতে থাকবে। প্রত্যেক অবস্থার প্রত্যেক বিরোধিতার ক্ষেত্রে এ আংটাকে ধারণকারীদের ঈমান দৃঢ় থাকবে এই আংটার সাথে যে সকল মু'মিন লেগে থাকবে তারা নিজেদের জীবন দিয়ে দিবে কিন্তু এই আংটা ছাড়বে না কেননা এটি ছাড়লে তার ঈমান বিনষ্ট হতে পারে।

আহমদীয়া জামাআতের ইতিহাস এমন ঘটনায় ভরপুর। মোখালেফাতের তুফান প্রকৃত মু'মিনকে তাদের ঈমান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে না। মায়ের সামনে সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে সন্তানের সামনে বাবাকে ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, বাবার সামনে সন্তানকে শহীদ করা হয়েছে। এরপর আহমদীয়াত থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসম্ভব কষ্টকর অবস্থা আহমদীদেরকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে। ধীরে ধীরে নির্যাতন করে মারা হয়েছে। আর এটি খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। এ বছরও কয়েকটি এমন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু যে ঈমানের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ সকল নির্যাতন তাদের কোন কিছুই বিগড়াতে পারে নাই।

যাই হোক আজ আমরা জুবিলী উৎসব উদযাপন করছি। সুতরাং, এই খুশী খিলাফতের ১০০ বছর পূর্ণ হওয়ায় আল্লাহ্ তাআলার ফজলের বারিধারার এ খুশী, আর এই শত বছর জুড়ে সবুজ শ্যামল এই নেয়ামতের সাথে আঁকড়ে থাকার কারণেই আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন। এই সবুজ শ্যামল বাগানকে দেখে যখন আমরা আনন্দিত এবং আল্লাহ্র শুকরিয়াও আদায় করছি সে ক্ষেত্রে ঐ সকল শহীদগণকেও স্মরণে রাখবেন। তাদের জন্য এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের জন্য দোয়া করুন যারা তাদের রক্ত দিয়ে এই বাগানের পানি সেচন করেছেন। নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তার সেই উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছেন যা ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়। 'উরওয়া' এর আর একটি অর্থ হল এমন যা সর্বদা সবুজ শ্যামল থাকে। অনাবৃষ্টিতেও এর মাঝে শুষ্কতা সৃষ্টি হতে দেয় না সুতরাং এটি এমন সবুজ শ্যামল যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান আনার কারণে জামাআত আকারে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দান করেছেন যা সর্বদা সতেজ থাকে এবং একে শিশির ভেজা ক্ষেত্র এবং সবুজ শ্যামল বাগান আকারে প্রতিষ্ঠিত রাখে। সুতরাং এই দৃঢ় হাতলকে আঁকড়ে ধরে

রাখলে এই সকল নেয়ামতসমূহের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে।

আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে বলেছেন, শয়তানের কথাকে অস্বীকার করবে আর ঈমানে অবিচল থাকবে।

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۷﴾

(সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)

অর্থাৎ এক নিশ্চিত যথাযথ বিশ্বাস দৃঢ় জিনিসকে ধরে রাখলো যা আদৌ ভঙ্গুর নয় আর অবশেষে বলা হয়েছে ওয়াল্লাহু সামিউন আলীম (বাকারা ঃ ২৫৭) অর্থাৎ আল্লাহ্ খুব বেশী শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাতা। সুতরাং যারা হৃদয়ের পবিত্রতার সাথে সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তাআলার এই নেয়ামতের সাথে সংযুক্ত থাকবে আর যারা আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হয়ে তার সাথে এই দৃঢ় হাতল দ্বারা সংযুক্ত থাকতে দোয়া করতে থাকবে এই সকল লোক স্মরণ রাখবেন আল্লাহ্ খুবই দোয়া শ্রবণকারী। তিনি আমাদের হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তিনি নেক নিয়্যতে কৃত দোয়াসমূহ এবং চেষ্টা প্রচেষ্টাসমূহ বিনষ্ট করেন না। আর এর ফলে আমাদের হৃদয়ও ঈমানে পরিপূর্ণ থাকবে। আর আমরা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত সমূহ থেকে বরকত মন্ডিত হতে থাকবো। এমনকি আমাদের প্রত্যেকের ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকবে আর সাধারণ দুর্বলতা সমূহ সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নেক নিয়্যত থাকার কারণে আমাদের মাঝে আর আমাদের বংশধরদের মাঝেও এমন ঈমান সৃষ্টি করতে থাকবেন যার দ্বারা আমাদের বংশধর এমনকি আমরাও সবুজ শ্যামল ফসলের অংশীদার হতে থাকবো।

সুতরাং আজ খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা যে দৃশ্য অবলোকন করছি, নিজেদের ঈমানকে সতেজ করছি, জামাআতের ঐক্য ও উন্নতির সুশোভিত ক্ষেত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে অপরাপরদের কাছেও অদ্ভুত মনে হচ্ছে আর কতিপয় হিংসুকদের হিংসাতে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। এমনটাই পাকিস্তানের অবস্থা। এটাও এযুগে রসূল করীম (সা.)-এর ভাবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করার ফলে এবং খিলাফতের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে সম্ভব হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পূর্ববর্তী নবীদের মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের মোজেযাসমূহও শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের নবী করীম (সা.)-এর নিদর্শনসমূহ আজও প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রকাশিত হতে থাকবে। যা কিছু আমার সাহায্যে প্রকাশিত হয় মূলতঃ এগুলো রসূল করীম (সা.) এরই নিদর্শন। (হাকীকাতুল ওহী রূহানী খাযায়েন ২৩ তম খন্ড, ৪৬৮-৪৬৯ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে রসূল করীম (সা.) এর সাথে এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা নিজের সাথে প্রত্যেক আহমদীকে সংযুক্ত রাখুন। এবং রসূল করীম (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী সৃষ্টি করুন। আর খিলাফতে আহমদীয়ার সুরক্ষাকল্পে কুরবানীর অঙ্গীকারকে পূর্ণকারী বানিয়ে রাখুন। আর আজ আমরা যে দৃশ্য অবলোকন করেছি, যে একতা দেখছি, যে সাম্য প্রত্যক্ষ করছি, খিলাফতের সাথে ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততার উদ্দীপনার প্রকাশ তা অপরাপরদের জন্য প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং এক মোজেযা ছিল। তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমি পূর্বেও বলেছি আমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার দরবারে বিনয়াবনত থাকি। যেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে তিনি নিজ নেয়ামতসমূহ আমাদের প্রত্যেকের জন্য আর আমাদের বংশধরদের জন্য স্থায়ী করে দেন।

এই শোকরগুজারীর প্রেরণাকে কখনো ভাটা পড়তে দিবেন না। এই শোকরগুজারীই আমাদের জন্য নতুন ও সবুজ শ্যামল বাগান সৃষ্টি করতে থাকবে আর তা আমাদের ঈমানের উন্নতির কারণ হবে। আজ জগত যেখানে খেলা-তামাশায় মত্ত তখন আর কেউ উপরোক্ত বিষয়ের প্রতিনিধিত্বকারী নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাআত-ই একক এক জামাআত যারা খিলাফতের পতাকাতলে নিজেদের বিভিন্ন দিকসমূহ সংশোধন করছে। এটি নিঃসন্দেহে এমন একটি পুরস্কার যার কৃতজ্ঞতা করে শেষ করা যাবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করার প্রচেষ্টা করতে থাকো এবং তা কেবল মৌখিক নয় বরং কার্যত কর্মের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা কর তখন আমি আমার পুরস্কারসমূহ দ্বারা তোমাদেরকে ভূষিত করতে থাকবো।

সুতরাং এর জন্য দোয়া করতে থাকুন। আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি যেন শুকরিয়া জ্ঞাপন-এর উচ্ছাস আর আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহ কখনো নিঃশেষ না হয়। প্রত্যেক মহূর্তে তা বৃদ্ধি করতে থাকুন। আমি পূর্বেও বলেছি, অগনিত ফ্যাক্স এবং চিঠিপত্র, শিশুরা ও বোনদের পক্ষ থেকে আসছে। আমি চেষ্টা করি যে এ শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ পত্রাদির উত্তর দিই এবং খুব দ্রুত এর উত্তর প্রদান করি কিন্তু কিছু বিলম্ব হতে পারে কেননা আজকাল ব্যস্ততা একটু বেশী এবং তা কিছু সফরের প্রস্তুতির

কারণে আর কিছু অন্য ব্যস্ততাও রয়েছে।

আমি পূর্বেও বলেছি, আর এখনও বলছি এবং দোয়াও করছি, আল্লাহ্ যেন আপনাদের সকলের ঈমান ও নিষ্ঠায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। এমন এমন পত্র এসেছে যা দেখে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। কত সুন্দর! চমৎকার ফুল আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাগানে ফুঁটিয়েছেন। যার সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া মাঝে মাঝে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। মোট কথা, আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সকলের ঈমান ও এখলাসে প্রবৃদ্ধি দান করুন।

আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহ এবং অনুগ্রহের মাঝে একটি নেয়ামত হলো এ যুগের আবিষ্কার স্যাটেলাইট টেলিভিশন, যা আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে দান করেছেন। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলব। এর সাথে আমাদের অনেক স্বেচ্ছাসেবক কাজ করেন এবং খুব মেহনতের সাথে তা করে থাকেন। বেতন নেন এমন লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। অধিকাংশই নিঃস্বার্থভাবে নিজের সময় এখানে দিয়ে থাকেন। আর এ কারণেই সমস্ত প্রোগ্রাম জগত উপভোগ করে। তারা একে সফল করার প্রচেষ্টা করে। এরা এ পরিশ্রম এজন্যে করছে যে, যেন জগতকে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের দৃশ্য দেখাতে পারে। আর এই ঐক্যের দৃশ্যও অবলোকন করতে পারে যা আল্লাহ্ তাআলা পুরস্কারস্বরূপ হযরত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাআতকে দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পয়গাম যেন জগতে পৌঁছাতে পারে। যেন পবিত্রচেতা লোকদের মনযোগ এদিকে আকর্ষিত হয় এবং তারা সত্যকে চিনতে পারে।

যখন আল্লাহ্ তাআলার ইলহাম দ্বারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে জামাআতের উন্নতির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁকে নিশ্চিতভাবে বলেছেন, নিশ্চিত তোমার-ই বিজয় হবে এবং জামাআত বিজয় লাভ করবে। অগণিত ইলহাম রয়েছে এ ব্যাপারে। মসীহ মাওউদ (আ.) একস্থলে বলেন, **"কাতাবাল্লাহু লাআগলিবান্না আনা ওয়া রুসূলী"** (মুজাদেলা ঃ ২২)। এটা তাঁর প্রতি এলহামও হয়েছে এবং এটি কুরআনের আয়াতও বটে। তিনি (আ.) এর অনুবাদ করেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা শুরু থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি এবং তাঁর রসূল বিজয়ী হবেন। এখানে ইসলামের দিকে ইশারা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাআতের প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা শুরু থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি এবং তাঁর রসূল বিজয়ী হবেন।

কেননা এ যুগে ইসলামের উন্নতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-

এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বিজয় দান করবেন এটি তকদীরের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এ কারণে জগতেও এর উপকরণ সৃষ্টি হয় এবং এ উপকরণ আল্লাহ্ তাআলা সময় মত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দান করেছেন এবং দান করতে থেকেছেন আর আজও তা দান করে চলছেন। তিনি (আ.) নিজ যুগে যে কিতাবসমূহ রচনা করেছেন এবং তা প্রচার করেছেন, বরং তা এক ধনভান্ডার ছিল যা তিনি জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা ঐ বিজয়ের একটি মাধ্যম ছিল। আর এ যুগে ঐ ধনভান্ডারকে M.T.A-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল স্থানে পৌঁছানোর মাধ্যমও আল্লাহ্ তাআলা সহজলভ্য করে দিয়েছেন। আমি পূর্বেও বলেছি, জামাআতের উন্নতি আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জারিকৃত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নেযামে খিলাফতের বরকত, একে দেখানোর মাধ্যম M.T.A বানিয়েছে। সুতরাং M.T.A ঐ উপকরণগুলোর মধ্য থেকে একটি উপকরণ যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর পয়গামকে জগতের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়েছে এবং পৌঁছাচ্ছেও। আর এ কথা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এ যুগের আবিষ্কারসমূহের যদি কোন সঠিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই হচ্ছে।

এ মুহূর্তে M.T.A-এর তিনটি চ্যানেল কেবল নিজেদের-ই তরবিয়তের কাজ করছে না বরং ইসলাম বিরোধীরা ইসলামের ঐ সকল দলিল দ্বারা নিরুত্তর হয়ে যাচ্ছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং M.T.A-কে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দেখানোর মাধ্যম বানিয়েছেন এবং বিজয় দান করতে একটি অস্ত্র হিসেবে সরবরাহ করেছেন। ঐ সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেক ঘরে M.T.A প্রবেশ করছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ ঐ কাজ যা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মনিব, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) করেছিলেন আর এ যুগে ঐ কার্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্কন্ধে অর্পিত।

যাই হোক ঐ কার্যসমূহ ত্বরান্বিত করা তাঁর (আ.) ওপর ঐ দায়িত্বই অর্পিত যার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা রসূল করীম (সা.)-এর ওপর অর্পন করেছিলেন। যার মাঝে নিদর্শন দেখানোও শর্ত ছিলো,

যার মাঝে হৃদয় পবিত্রকরণও ছিল। যার মাঝে কুরআন করীমকে বিস্তৃত করাও ছিল। মানুষের অভ্যন্তরে মনি-মানিক্য.. উদ্ভব করতে হবে। আর আজ আমরা যদি প্রত্যক্ষ করি। আর আজ যদি আমরা দেখি, এ যুগে ঐ যুগের আবিষ্কারসমূহের সঠিক ব্যবহার করতঃ ইসলামী দেশগুলোর চ্যানেলসমূহ অর্থাৎ কিছু ইসলামী ব্যবস্থাপনার চ্যানেল ব্যতীত কেবল মাত্র এম,টি,এ-ই রয়েছে, যে এ সমস্ত কার্য সম্পাদন করছে। যদি মনযোগ দিয়ে না শোনেন, তাহলে এ চারটি বিষয়-ই আপনাদের বোধগম্য হবে না। যদি একটি কথা তারা সঠিক বলে থাকে তবে অপরস্থলে তারা এমন এক অবান্তর কথা বলেন যার দ্বারা কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি ইসলামের সঠিক চিত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না। অন্যদিকে পৃথিবীতে অন্যান্য T.V. চ্যানেল রয়েছে যারা বিজ্ঞাপন ব্যতীত চলতেই পারে না, যার মাঝে খেল-তামাশা এবং বৃথা কার্যক্রম চলে। ইসলামী রাষ্ট্রের চ্যানেলগুলোরও ঐ একই অবস্থা। চিত্ত বিনোদন এর নামে যে প্রোগ্রাম তাও বৃথা ও বেহুদা। সুতরাং আজ একটি মাত্র চ্যানেল রয়েছে, যা মসীহ্ মাহদীর গোলামের। যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করছে। ঐ উদ্দেশ্যকে সম্পাদন করছে যে উদ্দেশ্যে রসূল করীম (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং এদিকেও আহমদীদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নিজেদের তরবিয়তের জন্য আর এ উদ্দেশ্যেও যে বড় মেহনতের সাথে এ চ্যানেলটি চলমান, এটা নিয়মিত দেখুন, শুনুন। বিশেষভাবে খুতবা সমূহ আর অন্যান্য যে তরবিয়তী প্রোগ্রাম রয়েছে, সেদিকেও মনযোগ দেয়া প্রয়োজন। আর এ কথাটি ঐ দিকে মনযোগ আকর্ষণার্থে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যে নেয়ামতসমূহ দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করুন যা খিলাফতের অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামাআতকে নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দান করেছেন। আর এ সুসংবাদ M.T.A-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়াচ্ছে। এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া দরকার, যদি খিলাফত না থাকতো তাহলে যতই নেক নিয়্যতে চেষ্টা প্রচেষ্টা করুন না কেন, কোন আঞ্জুমান বা কোন ব্যবস্থাপনাই এ চ্যানেল এভাবে চালাতে পারে না। সুতরাং এই এম,টি,এ আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন, এটিও খিলাফতের বরকত সমূহের মাঝে একটি বরকত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামাআতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ফজল সমূহের মধ্য থেকে একটি ফজল। এ কারণে এর দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে উপকৃত হতে হবে আর ঐ সকল বিষয়ও যার আমি উল্লেখ করেছি, যা খিলাফত বাদে চলা অসম্ভব। এ কারণে করেছি যে, প্রত্যেকের এ অনুভূতি যেন সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার যে যে ব্যবস্থা চালু করেছেন তা খিলাফতের পুরস্কার দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন। সুতরাং সর্বদা এর প্রতি যত্নবান হোন। খিলাফত জুবিলীর এই বক্তৃতার মাধ্যমে প্রত্যেক আহমদীর মাঝে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এটা যেন জাগতিক পরিবর্তন না হয়, জাগতিক স্পৃহা যেন না হয়। বরং এটাকে সর্বদা স্মরণ রাখবেন। একে তদারক করুন এবং স্থায়ীভাবে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। আমি যে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, সে অঙ্গীকারেরও বড় প্রভাব পড়েছে। প্রত্যেকের মাঝে এ প্রভাব প্রকাশিত হচ্ছে। এটাকে সর্বদা স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকুন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যে অঙ্গীকার কর তা পূর্ণ করো কেননা তোমাদের অঙ্গীকার সমূহের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

নেকীর মাঝে নেযামে জামআতের এতাআত এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খিলাফতের আনুগত্যের মাঝে জামআতের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যও একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। এটাকে বাদ দিয়ে না কোন নেকী আছে আর না-ই অঙ্গীকার পূরণ।

সুতরাং আজ যখন এ বিষয়টি মস্তিষ্কে সতেজ অবস্থায় রয়েছে, আমি এ জন্য রিপিট করছি যেন এ বিষয়টি সর্বদা আরও সতেজ থাকে আর এ অঙ্গীকার আপনাদের মাঝে যথেষ্ট স্থায়িত্ব সৃষ্টি করতে থাকে। সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কোন অঙ্গীকার, কোন বিষয় আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। চিঠি পত্রের মাঝেও লোকেরা লিখে থাকে, আমরা তো অঙ্গীকার করেছি, এখন আমরা ইনশাআল্লাহ্ এর ওপর আমল করব। কিন্তু সাথে এ দোয়াও করুন, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করেন, কেননা তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া কিছুতেই তা সম্ভবপর নয়। সুতরাং এর জন্য আল্লাহ্ তাআলা পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, এর ওপরও আমল করা আবশ্যক অর্থাৎ নিজেদের ইবাদতের

মান পূর্বের তুলনায় উন্নত করুন।

নেকীতে পূর্বের তুলনায় উন্নতি করুন এবং নেককর্ম করার চেষ্টাতে রত থাকুন। নেকীর মাঝে নেযামে জামাআতের এতাআত এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খিলাফতের আনুগত্যের মাঝে জামাআতের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যও একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। এটাকে বাদ দিয়ে না কোন নেকী আছে আর না-ই অঙ্গীকার পূরণ। জামাআতী ব্যবস্থাপনাও খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ কারণে এর আনুগত্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে তৌফিক দিন, প্রত্যেকে নিজেদের অঙ্গীকারের ওপর যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে থাকে।

২৭ মে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ সুসংবাদও দিয়েছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ ইতালিতে মসজিদ ও মিশন হাউজ বানানোর প্রচেষ্টা চলছিল। আর এর জন্য জায়গাও পাওয়া যাচ্ছিল না। এই ২৭ মে তারিখে কাউন্সিল ডেকে নিয়ে এক টুকরো জায়গা উক্ত উদ্দেশ্যে দিয়েছে। ক্রয়ও সম্পন্ন হয়েছে। এ দেশে, যেখানে খৃষ্টানদের খিলাফত আজও প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্ তাআলা খিলাফতে আহমদীয়াকে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এমন একটি জমি দান করেছেন যেখানে 'ইনশাআল্লাহ্' মসীহ্ ও মাহদীর গোলামদের এক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একটি মসজিদও হবে। ইনশাআল্লাহ্।

এমনিভাবে আমাদের এই যে অনুষ্ঠান ছিল এবং এখানে যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন। পাকিস্তানে মৌলভীদের হট্টগোল থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানী জামাআত এর সাথে অংশগ্রহণ করেছে। নিজেদের পক্ষ থেকেও যুবকদের প্রোগ্রাম ছিলো যা তারা বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু সেখানের জামাআতে ঐ ভাবে বঞ্চিত থাকার অনুভূতি সৃষ্টি হয়নি যেভাবে ১৯৮৯ সালে শত বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান হয়েছিল। সমস্ত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে একটি অরডিনেন্স এসেছিল। যার ফলে জামাআতে আহমদীয়া কোন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠান করতে পারেনি। বাচ্চাদের মাঝে মিষ্টি-চকলেট বিতরণ করাও সম্ভব হয় নি। সে দেশের এমনি অবস্থা ছিল এবং আছেও আর এ মুহূর্তে চিন্তার বিষয় সেটাই ছিল কেননা পাঞ্জাবে আজও ঐ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত যা সে যুগে ছিল। যাই হোক, আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন এবং ২৭ মে-এর জলসা যেরূপ উদযাপন করার ছিল, করা হয়েছে। অন্যান্য অনুষ্ঠানও করা হয়েছে। খাবার ও মিষ্টি বিতরণ করার কথা ছিল, সেটাও করা হয়েছে। ঐ মৌলভীদের অবস্থা দেখুন, যেহেতু এ অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে হয়ে গেছে এবং যথেষ্ট শোরগোল ছিল না এ কারণে তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে জানতে পারে নাই আর তারা মনে করেছে, সরকার বাধা দান করেছে। অথবা সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদ পত্রে (নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ) বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতটা কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি। যাই হোক, মৌলভীরা বলে থাকে, কাদিয়ানীদেরকে উক্ত অনুষ্ঠান করতে দেয়া হয়নি আর শিশুদেরকে মিষ্টি বিতরণ করতে দেয়া হয়নি, ফূর্তি করতে দেয়া হয়নি সুতরাং এ সরকার অনেক বড় গুরু দায়িত্ব পালন করেছে এবং এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছে। বাচ্চাদেরকে মিষ্টি খাওয়ালেই উম্মতে মুসলিমা ধ্বংস হয়ে যেতো। তাদের মস্তিষ্কের এমনি অবস্থা অথচ তাদের জানা নেই, তারা স্বয়ং ধ্বংসের দিকে নিপতিত। এ কারণে পাকিস্তানের জন্য দোয়া করুন। ঐ মোল্লাদের হয়তো কখনোই জ্ঞান হবে না কিন্তু যারা সাধারণ জনগণ তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। সেখানের রাজনীতিবিদরা স্বার্থপরতায় যেন মশগুল না থাকে বরং তারা দেশের অধিকার সংরক্ষণকারী যেন হয়। গরীবের অধিকার যেন আদায় করে। এ মুহূর্তে পাকিস্তানের যে অবস্থা তা একেবারে শোচনীয়। রাজকোষ খালি পড়ে আছে। খাবার নেই এ সত্ত্বেও লুন্ঠন অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে ঘুষ নেয়া হয়। জনসাধারণ ক্ষুধাপীড়িত, সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। তাদের কেবল নিজেদের চেয়ার নিয়ে চিন্তা। আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ জনগণের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

যেক্ষেত্রে আমরা উৎসব উৎযাপন করছি সেক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য আহমদীরাও এ উৎসব উদযাপন করছে। খিলাফত জুবিলীও উদযাপন করছে, শুকরিয়া জ্ঞাপন স্বরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠানও উদযাপন করছে। দোয়ার মাঝে পাকিস্তানকেও স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তাআলা ঐ গরীবদের অবস্থাও পরিবর্তন করুন। যদি সরকার জালেম হয় তবে তাদের থেকেও মুক্তি দিন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। মুসলিম দেশ সমূহের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাদেরকে মসীহ্ মাহদীকে চেনার তৌফিক দেন। জগতের জন্য দোয়া করুন কেননা যেভাবে জগৎ ধ্বংসের দিকে ধাবমান, আল্লাহ্ তাআলা নিজ শাস্তি থেকে এদেরকে হেফাজতে রাখুন এবং সত্যের পরিচয় লাভের তৌফিক দিন। জগত যেন এমন দৃশ্য অবলোকন করে যেখানে কেবলমাত্র আল্লাহ্র রাজত্ব কায়েম হবে এবং কেবল মাত্র রসূল করীম (সা.) এর পতাকা উড়বে। (আমীন)।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (পলাশ)**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

কুরআন আমার প্রিয় কুরআন

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

ইয়া ইলাহী! তেরা ফুরক্বাঁ হ্যা কে ইক আলাম হ্যা

জো-যরুরী থা ওহ সব ইস মেঁ মুহাইয়া নিক্লা ॥

(হে খোদা তোমার কুরআন যে এক বিশ্ব যা প্রয়োজনীয় এর সব কিছু এতে প্রস্তুত পাওয়া গেল ॥ দুররে সামীন।)

আল কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

আমরা জানি মহান আল্লাহ্ তাআলার মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এটা আল্লাহ্ তাআলার শেষ ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। কিয়ামত কাল অব্দি এটা সারা বিশ্বের মানবমন্ডলীকে সঠিক পথ দেখিয়ে যেতে থাকবে। এতে রয়েছে মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী। এর কোন কোনটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে পূর্ণ হয়েছে। আবার এর কোন কোনটি পরবর্তীকালে পূর্ণ হয়েছে এবং কোন কোনটি পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এসব পূর্ণ হলেই কেবল মানুষ এ সম্পর্কে জানতে পারবে।

কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণীর একটা বৈশিষ্ট্য এই, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বারে বারে পূর্ণ হয়ে থাকে এবং নানা অর্থে পূর্ণ হয়ে থাকে। ভৌতভাবেও পূর্ণ হয়ে থাকে এবং আধ্যাত্মিকভাবেও পূর্ণ হয়ে থাকে। এখন আমরা কুরআন করীমের এমন কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করবো যা ইতোমধ্যে পুরো হয়ে গেছে। এগুলোর মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হবে যে আল্লাহ্ তাআলা সত্যিই আছেন। তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সত্য নবী এবং আল কুরআন প্রকৃতই ঐশী কালাম বা আল্লাহ্‌র বাণী। সর্বোপরি এটাও প্রমাণিত হবে, মহান ধর্ম ইসলাম সত্য।

‘কুরআন’ নামেই ভবিষ্যদ্বাণী

কুরআন কারা‘আ মূল ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। এর অর্থ বার বার যা পাঠ করা হয়ে থেকে। কুরআন মজীদের একটি বিশেষ আয়াত যার অর্থ হলো– আর আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সপ্ত আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করেছি (সূরা হিজর ঃ ৮৮)। একে সাবআম মিনাল মাসানী বা সূরা ফাতিহা বলা হয়ে থাকে। কুরআন যে একদিন সারাবিশ্বে বহুল পঠিত গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে সে কথাই এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের ফলে কোথাও না কোথাও নামাযের সময় হচ্ছে। আর নামায পড়তে গিয়ে নামাযী-রা কমপক্ষে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকেন। অন্যান্য আয়াতের কথা না হয় বাদই দিলাম। অতএব পৃথিবীতে এমন একটি মুহূর্ত নেই যখন কুরআন পাঠ করা হয় না। তাই একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে কুরআন পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে বহুল পঠিত গ্রন্থ। একথা বিখ্যাত প্রাচ্যবিদরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন–জার্মান বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক নলডিকি বলেন ঃ “যেহেতু কুরআনের ব্যবহার উপাসনালয়ে, বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য ভাবে খ্রীষ্টান দেশগুলোতে বাইবেল পাঠের তুলনায় অধিকতর সেহেতু এটা প্রকৃতই বলা হয়েছে, বিশ্বে সবচাইতে অধিক ব্যাপকভাবে পঠিত গ্রন্থ হলো কুরআন” (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, নবম সংস্করণ)। কিন্তু যেদিন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। সেদিন কুরআন করীমের ব্যাপক পঠন সম্বন্ধে এর মালিক আল্লাহ্ সুবহানুহু তাআলা ছাড়া কেউই জানতো না। আজ প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং কুরআনের নামকরণ সার্থক হয়েছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আলা যালিক।

কুরআন আল্ কিতাব

‘যালিকাল কিতাব’ এ সেই গ্রন্থ যে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী গ্রন্থে অর্থাৎ তাওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সূরা বাকারার প্রথমেই কুরআন করীমকে আল্ কিতাব বা পরিপূর্ণ গ্রন্থ বা মহাগ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ তখন কুরআন ছিল মাত্র খন্ডাংশ। একটু একটু করে অবতীর্ণ হচ্ছিলো। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এর অবতীর্ণ হওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। মহান আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলার সর্বজ্ঞানে এটা নির্দিষ্ট হয়ে ছিল যে এ কুরআন একদিন একখানা সুসমন্বিত চমৎকার গ্রন্থের আকারে সারা বিশ্বে সুপরিচিতি লাভ করবে। কালের স্রোতে কত উত্থান পতন হয়ে গেছে কিন্তু আল্ কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছর পর একখানা গ্রন্থ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। বলাবাহুল্য এর সার্বিক সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে সেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে আল্লাহ্ এর সৃষ্টি লগ্নে একে মহা গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং শেষ কালে এ কুরআন মহাগ্রন্থ হিসেবেও রূপ লাভ করে আছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

মশা ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণু বহণ করে

কুরআন করীমে মশার মত এক ছোট পতঙ্গের তুলনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার ২৭ আয়াতে বলেছেন – ফামা ফাওকাহা অর্থাৎ মশা যা বহন করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে’ (রাহে.) এখেকে এ বিষয়টির

অনুসিদ্ধান্ত করে বলেছেন, মশার এক ক্ষুদ্র পতঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতির মাঝে ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু প্রভৃতিরূপে যে প্রলয়ংকরী ধ্বংস এনে থাকেন এর স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কুরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন এ প্রসঙ্গে কারও ধারণাও ছিল না। মহান আল্লাহ্ এটা অবশ্যই জানতেন।

হিজরতের পর পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

অনেকের মতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে হিজরত করার সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : **ইন্নাল্লাযী ফারাযা 'আলায়কাল কুরআনা লারাদ্দুকা ইলা মা'আদিন** অর্থাৎ নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনকে ফরয করেছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন (সূরা কাসাস ঃ ৮৬)। প্রত্যেক নবীকেই সাধারণত স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে হিজরত করতে হয়েছে। এ আয়াতে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। একতো নবী করীম (সা.)-কে স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে হিজরত করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত পুনরায় স্বদেশে তাঁর (সা.) ফিরে আসার সৌভাগ্য হবে। প্রত্যেক ইতিহাস পাঠক এটা অবগত তিনি কী করুণভাবে রাতে আঁধারে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরতে করেছিলেন এবং ১০ বছর যেতে না যেতেই প্রায় ১০ সহস্রাধিক সাহাবীসহ বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। এটা কেবল সেই আল্লাহ্র অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছিল যিনি তাঁর (সা.) ওপর মহান কুরআন অবতীর্ণ করে এর মাধ্যমে তাঁকে (সা.) কল্যাণমন্ডিত করেছিলেন এবং তাঁকে পথনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

বদর প্রান্তরে মুসলমানদের জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

হিজরতের পরে মক্কার কাফিররা মুসলমানদের শাস্তি দেয়ার জন্যে মদীনা পর্যন্ত ধাওয়া করে। কিন্তু সূরা রূমের ৩ আয়াতে যেমন কুরায়েশদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছিল তেমনি সূরা রূমের ৫-৬ আয়াতে মুসলমানদের অভাবনীয়ভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে জয় লাভের ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছিল। সূরা আনফালের ৪৩ আয়াতেও এ বিজয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কার কাফিররা এক হাজার লোকের একটি রণনৈপুন্য বাহিনী নিয়ে মদীনার অদূরে বদরের প্রান্তরে সমবেত হয়। তাদের ছিল ৭০০ উট, ঘোড়া ১০০ টি। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। এদের মাঝে অল্প বয়স্ক বালকও ছিল। ৬০ জন ছিলেন মুহাজির এবং বাকীরা ছিলেন আনসার। তাঁদের ছিল ৭০টি উট এবং দুটি ঘোড়া। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্র সাহায্য ও অঙ্গীকার অনুযায়ী ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তথা ১৭ই রমযান রোজ শুক্রবারের এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করেন। এভাবে সূরা কামার এর ৪৬ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীও পরিপূর্ণতা লাভ করলো। এভাবে উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এতে বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী 'কেদরের শৌর্যে ভূলুন্ঠিত হবে' পূর্ণ হয় (যিশাইয়-২১:১৬-১৭)। এখানে উল্লেখ্য, কেদর ছিল মক্কার কাফিরদের একজন বিখ্যাত পূর্বপুরুষ।

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

সূরা সাদ এর ১২ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল–**জুনদুম্মা হুনালিকা মাহযূমুম্মিনাল আহযাব** অর্থাৎ (তারা) বিভিন্ন দল সম্বয়ে একটি বাহিনী যারা সেখানে পরাভূত হবে। এখানে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার অবকাশ নেই। হুযূর (সা.) হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ অনুযায়ী কাফিরদের এ বিরাট সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মদীনায় যুদ্ধ করার এক নতুন পরিকল্পনা আঁটলেন। উপরোক্ত আয়াতটিতে যুগপৎভাবে চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। চ্যালেঞ্জটি হলো: হে কাফিররা তোমরা নিজ নিজ জাতির শক্তি ও সামর্থ্য একত্র করে সবাই মিলে মিত্র শক্তি গঠন করে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে এসো। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো; তোমাদের এ সম্মিলিত বাহিনী ইসলামের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার দুঃসাহস যদি দেখাও তাহলে তোমরা শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত ও বিনাশ হয়ে যাবে। জোরালো ভবিষ্যদ্বাণীটি অতি শান ও শওকত ও মর্যাদার সাথে অক্ষরে অক্ষরে খন্দকের যুদ্ধের সময় পূর্ণ হয়েছিল। অথচ এতবড় বিরাট বাহিনীর সাথে মুসলমানদের জয়লাভ করার বাহ্যত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এটা সাধিত হয়েছিল শুধু মহান আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও কৃপায়। মুসলমান কেবল মানসিক শক্তি ও দোয়ার বলে অলৌকিকভাবে এ অসম যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন।

রোমানদের বিজয়লাভ

কুরআন করীমের সূরা রূমের ৩ আয়াতে রোমানদের বিজয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। ৬০২ খ্রীষ্টাব্দের পর রোমানরা পারশিয়ানদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয়। প্রায় দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে পারশিয়ানারা রোমানদের নিগৃহীত করতে থাকে। ৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-কে সংবাদ দেয়া হয়েছিল, রোমানরা আগামী ৮-৯ বছরের মধ্যে তাদের হৃত রাজ্য পুনরায় দখল করবে। এটা ছিল একটি অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ব্যাপার। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কথা বাস্তবায়ন করতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হিরাক্লিয়াস নবোদ্যমে পারশ্য বাহিনীর

মোকাবেলায় মাঠে অবতীর্ণ হন। ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর মেডিয়ায় এগিয়ে যান এবং সেখানকার 'গওজাক'-এর বিশাল অগ্নি উপসনালয় ধ্বংস করে জেরুজালেম ধ্বংসের প্রতিশোধ নেন। এরপর থেকে পারশ্য সৈন্য একে একে রোমানদের হাতে পরাজিত হতে থাকে এবং ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে খস্‌রুর পুত্র সিরোসের নিহত হওয়ার সাথে সাথে পারশ্য সাম্রাজ্য অরাজকতায় লিপ্ত হয় (এন সাই, ব্রিট)। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গীবনের ভাষায় বলতে হয়–পারশ্য বাহিনীর বিজয়ের মাঝে তিনি (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.): কী নির্দ্ধিধায় উচ্চারণ করলেন, বেশি কতগুলো বছর অতীত হবে না, বিজয় রোমানদের পতাকায় পরিবর্তন করবে। ....যে সময়ে এ ভাবিষ্যদ্বাণী উচ্চরিত হয়েছিল তখন এর পূর্ণ হওয়ার দূরতম অবস্থাও বিদ্যমান ছিল না। কেননা, বারটি বছর যাবৎ হেরাক্লিয়াসের ক্রমাগত পরাজয় ও বিপর্যয় এটা ঘোষণা করে আসছিল যে তাঁর সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি অতি আসন্ন" (রাইজ ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার, ঐতিহাসিত গিবন প্রণীত, পঞ্চম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)।

ইসরাঈলী রাষ্ট্রের পত্তন

কুরআন করীমের সূরা বনী ইসরাঈলের ১০৫ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে পুনরায় 'আরযে মুকাদ্দাস' অর্থাৎ পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্র করার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫৬ সনে নবুখদনিৎসর কর্তৃক এবং ৭০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট টাইটাস কর্তৃক ইহুদীরা নিগৃহীত হয় এবং জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধেও তারা জার্মানিতে হিটলার কর্তৃক অনেক নিগৃহীত হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক ইহুদী নিহতও হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বেলফোর ঘোষণার অধীন বনী ইসরাঈলের বায়তুল মুকাদ্দাস বা পালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তন এবং সেখানে ক্ষুদ্র একটি ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কুরআনের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অসাধারণভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। উল্লেখের বিষয়, বনী ইসরাঈলের জন্যে পরবর্তীকালের আযাবের প্রতিশ্রুতিও এ আয়াতে রয়েছে। এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে অনুষ্ঠিতব্য বলে তাদের ললাটে লিখে দেয়া হয়েছে যেভাবে তারা প্রথম মসীহ্ (আ.)-এর যুগে শাস্তি পেয়েছিল। এ আয়াতে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের জন্যও ২ বার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তারা চেঙ্গিস খানের পুত্র হালাকু খানের মাধ্যমে ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার শাস্তি পেয়েছে এবং শেষ যুগে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে না মানার কারণে তাদের ওপর ঐশী শাস্তি আপতিত হবে আরেকবার। সত্যি কথা বলতে কি কোন কোন নামধারী মুসলিম রাষ্ট্র পেতেও আছে।

সূরা আম্বিয়ার ১০৬ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত উমর (রা.)-এর সময় মুসলমানরা প্যালেস্টাইন অধিকার করে। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এটা মুসলমানদের অধিকারে ছিল। ক্রুসডের সময় এটা হাত বদল হয়। পরবর্তীতে কুচক্রীদের চক্রান্তে এখানে ইসরাঈল রাষ্ট্রের পত্তন হয়। ফলে দীর্ঘদিন থেকে এখানে ফিলিস্তীনি মুসলমান ও ইসরাঈলীদের মাঝে সংঘাত চলে আসছে। তবে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন পবিত্র ভূমির মালিকানা পুনরায় আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমানদের হাতে চলে আসবে। কুরআনের আলোকে এটাই বুঝা যাচ্ছে।

ইসলামের বিশ্ব বিজয়

কুরআন করীমের সূরা সাফ্‌ফের ১০ আয়াতে আমরা দেখতে পাই – **হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহি ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকূন** অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহ্) তাঁর রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন]। কুরআন করীমে সূরা তাওবাহ্ এবং ফাতহ্ প্রভৃতিতেও এ ধরনের আয়াত রয়ছে। তফসীরকারকদের অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত যে ইসলামের এ বিশ্ব বিজয় 'ইনদা খুরুজিল মাহদী' অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে ঘটবে (বিহারুল আনওয়ার)।

হযরত নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তকমীলে শরীয়ত বা শরীয়তের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছিল। যেমন সূরা মায়েদার ৪ আয়াতে বলা হয়েছে– আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। কিন্তু এটা বাস্তব, তাঁর (সা.) সময়ে তকমীলে ইশাআত বা প্রচারের পূর্ণতা সারা বিশ্বে ঘটেনি। বিশ্বের ২টি মহাদেশের মাত্র কয়েকটি এলাকায় ৩/৪ টি ধর্মের ওপর এ ইসলাম প্রাধান্য লাভ করেছিল। সব ধর্মের ওপর ইসলামের জাহির হওয়া বা প্রাধান্য লাভ করার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, এ সময়ে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মত দুটো মহাদেশের কথা মানুষ জানতোই না। বর্তমানে সারা বিশ্ব মানুষের হাতের মুঠোয়। পৃথিবীতে প্রায় ২৫০০ ধর্ম আছে বলে কথিত হয়ে থাকে। সূরা জুমুআর ৪ আয়াত অনুযায়ী ইসলামের এ বিশ্ববিজয় সংঘটিত হওয়ার কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় আবির্ভাবের মাধ্যমে পারশ্য বংশীয় ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হিসেবে। সেই ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হলেন হযরত মির্যা গোলাম

আহমদ কাদিয়ানী। তিনি এসে ইসলামের যে জামাআত প্রতিষ্ঠিত করেছেন এর নাম 'আহমদী জামাআত'। এ আহমদী জামাআতের নিরলস চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে আজ এ জামাআতের ১৯৩টি শাখা ৫টি মহাদেশে বিস্তার করছে। এ জামাআতের সদস্যরা কুরআনের শিক্ষার বলে বলীয়ান হয়ে বিনা রক্তপাতে সারা বিশ্বে কুরআনের শিক্ষার আলোকে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন সারা বিশ্বে ধর্ম বলতে বুঝাবে ইসলামকে এবং নেতা বলতে বুঝাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লমাকে। সেদিন সারা বিশ্বের মানুষ উম্মতে ওয়াহেদায় অর্থাৎ এক উম্মতে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা।

উটনী বেকার হবে ও নানা প্রকার যানবাহন আবিষ্কৃত হবে

উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে উটের ওপর চড়েই মানুষ দেশে বিদেশে যাতায়াত করতো এবং মালামাল বহন করতো। কুরআন করীমে সূরা তকভীরের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে – এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলো বেকার অবস্থায় পরিত্যক্ত হবে। এর ব্যখ্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও বলেছেন –উটনী বেকার হবে এবং এতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না (মুসলিম)। নানা প্রকার বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যেমন দ্রুতগামী জাহাজ, রেলগাড়ী প্রভৃতি এবং পরবর্তীতে তেল চালিত মটর, বিমান প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এখন আর কেউ মান্ধাতার আমলের উটে চড়ে যাতায়াত করে না। তাই উটনী বেকার হয়েছে। আমরা ২০০৫ - ২০০৬ সনে হজ্জে গিয়ে মক্কা মদীনাতে তেমন কোন উট দেখিনি। কেবল আরাফাতের মাঠে ছবি তোলার জন্যে একটি উট দেখেছিলাম। কুরআন এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থভাবে পূর্ণ হয়েছে। সূরা রহমানের ২৫ আয়াতে পর্বতের ন্যায় সমুদ্রগামী জাহাজের উল্লেখ করা হয়েছে। এবার সিডরের পরে বাংলাদেশে ১৮ তলা বিশিষ্ট আমেরিকার জাহাজ যে এসেছিল তা কে না জানে। এ ছাড়াও সূরা নাহলের ৯ আয়াতে বিভিন্ন যানবাহনাদির কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন, – তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা) আরও এমন যানবাহন সৃষ্টি করবেন যা তোমরা অবগত নও। দিন দিন নতুন নতুন যানবাহান আবিষ্কৃত হয়ে কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সৌর শক্তি ও আনবিক শক্তি চালিত বিভিন্ন যানবাহ-নাদির আবিষ্কারের কথাও এখন আমরা জানতে পারছি। এসব উম্মী রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আলেমুল গায়েব খোদাই তাঁকে জানিয়েছিলেন। তাঁর (সা.) পক্ষে এসব জানার কোন অবকাশ ছিল না।

খাল কেটে সাগরকে মিলিত করা হবে এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করা হবে।

আল্ কুরআনের সূরা রহমানের ২০-২১ আয়াতে বলা হয়েছে – তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করবেন যে (এক সময়ে) উভয় মিলিত হবে। (বর্তমানে) উভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে (যদ্দরুন) এরা একে অপরের মাঝে প্রবেশ করতে পারছে না। কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে মানব তৈরী পানামা খাল এবং সুয়েজ খাল যুক্ত করেছে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে। এ ছাড়া সূরা তাকভীরের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে – আর নদীগুলো যখন শুকিয়ে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে পরবর্তীকালে সেচ কার্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ডাম বা বাঁধ তৈরী করে এবং খাল খননের মাধ্যমে এক নদী থেকে অন্য নদীতে পানি প্রবাহিত করা হবে। এতে যে নদী থেকে পানি প্রবাহিত করা হবে সেটা শুকিয়ে যাবে বা এর পানি কমে যাবে। আজকাল আমরা এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখছি। আর সমুদ্রে পরমাণু যুদ্ধের ফলে আগুন লাগাতে যে পানি শুকিয়ে যাবে এটা সেদিকেও ইঙ্গিত করতে পারে।

প্লেগ, ক্যান্সার, এইডস প্রভৃতি রোগের ভবিষ্যদ্বাণী

আমরা সূরা নমলের ৮৩ আয়াত পাঠে জানতে পারি, আল্লাহ্ তাআলা মাটি থেকে এক প্রকার কীট বের করবেন। এগুলো মানুষকে কামড়িয়ে আক্রান্ত করবে। কেননা, তখনকার মানুষ আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অমান্য করবে। ভবিষ্যতে দেখা দেবে এ আয়াতে এমন কতগুলো রোগের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে। প্লেগ, ক্যান্সার, এইডস প্রভৃতি রোগ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে ছিল না। বিগত শতাব্দী থেকে এগুলো মানুষকে আক্রান্ত করেছে। এগুলো এক প্রকার ক্ষত বা ঘা জাতীয় রোগ। রোগের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা দৃষ্টে আর এ যুগেই মানুষ সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করছে এবং তাঁর নিদর্শন অস্বীকার করছে বিধায় কুরআনের উপরোক্ত আয়াত যে এসব রোগের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব রোগ বালাই যে শেষ যুগে আগমনকারী বিশ্ব মহাপুরুষের আগমনের নিদর্শনস্বরূপ তাও অস্বীকার করার জো নেই। আল্লাহ্

তাআলা নিজ করুণায় আমাদেরকে এসব রোগ থেকে সুরক্ষা করুন, আমীন।

বিশেষ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ

সূরা কিয়ামার ৯-১০ আয়াতে আমরা পাঠ করে থাকি চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে এবং সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্র করা হবে। এ আয়াতগুলোর অন্য অর্থ ছাড়াও শেষ যুগে একটি বিশেষ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহনের প্রতি ইঙ্গিত করছে। এটা হবে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতার একটি নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি বিখ্যাত হাদীস ও দ্রষ্টব্য। বায়হাকী ও দারকুৎনী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধে একই রমযান মাসে একজন দাবীকারকের উপস্থিতিতে এ গ্রহণ দুটি তাঁর সত্যতার প্রমাণ দিয়ে গেছে। এ কোন মানবীয় কাজ নয়। হাজার বছর আগে জানান এ গ্রহণদ্বয় আল্লাহ্ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপস্থিতিতে সংঘটিত করে তাঁর মহান কিতাব কুরআনের সত্যতায়ও মোহর মেরে দিয়েছেন।

মহাশূন্যে যাত্রার সফলতা

কুরআন করীমের সূরা আর রহমানের ৩৪ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা জিন ইনসানের দল তথা পরাশক্তিগুলোকে লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন – তারা আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত ভেদ করে যাওয়ার যত চেষ্টাই করুক তারা সর্বাধিপতি আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ছাড়া তা কখনো পারবে না। এখানে অন্যান্য ব্যাখ্যা ছাড়া পরোক্ষভাবে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে একদিন তারা আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত ভেদ করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে আল্লাহ্র অনুমোদনক্রমে। ১৯৬৯ সনে আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত নভোযানে নেইল আর্মস্টং প্রমুখদের চন্দ্রের পৃষ্ঠে অবতরণের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পূর্ণ হয়েছে। তখন অনেক মৌলভী সাহেব একে বিশ্বাস করেন নি। অথচ এটা ছিল আল কুরআনের একটি মহা ভবিষ্যদ্বাণী। এ ভাবে মঙ্গল গ্রহ প্রভৃতিতে যাওয়ার জন্যে মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। কিন্তু তারা অন্য গ্রহ উপগ্রহে যেতে পারবে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অসীম মহা বিশ্বে আল্লাহ্র কর্তৃত্বকে (Authority) ছাড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না। এ ভবিষ্যদ্বাণীও এ আয়াতে সুপ্ত রয়েছে।

বিভিন্ন পশুদেরকে জড় করে চিড়িয়াখানা তৈরীর ভবিষ্যদ্বাণী

সূরা তাকভীরের ৬ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি জন্তু জানোয়ার এবং পশু পাখীকে বিশ্বে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে এক স্থানে জমা করা হবে। এ স্থানের নাম দেয়া হবে চিড়িয়া খানা বা অভয়ারণ্য। এগুলোর মাধ্যমে মানুষ একদিকে যেমন জ্ঞান লাভ করবে, আনন্দ লাভ করবে তেমনি এসব প্রজাতি যেন বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যায় সে জন্যে পরীক্ষা নীরিক্ষায় মাধ্যম চেষ্টাপ্রচেষ্টা চালানো হবে। এতে আরও একটি অর্থ বুঝতে পারি, বন্য পশু সদৃশ আদিবাসী মানুষগুলো জোট বেঁধে নিজেদের নাগরিক অধিকার আদায়ের চেষ্টা করবে। এজন্যে তারা একস্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে সমবেত হওয়ার চেষ্টা করবে। পনরশ বছর পূর্বে এসব কেউ চিন্তাও করতে পারে নি। কিন্তু কুরআন করীম সংক্ষেপে এসবই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। এ সূরার ৮ আয়াত থেকেও এ ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পাহাড় পর্বতকে স্থানচ্যুত করা হবে

সূরা তাকভীরের ৪ আয়াতে পাহাড় পর্বতকে ডিনামাইট প্রভৃতি দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে সমতল করে মানুষের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হবে। চীনে এর যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে। পাহাড় পর্বত দিয়ে নেতৃবৃন্দকেও বুঝায়। এমন সময় আসবে তাদের অধিকার খর্ব করা হবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বহু রাজার রাজত্ব কেড়ে নিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ দিকেও এ আয়াত ইঙ্গিত করতে পারে।

এভাবে এমন এক যুগ আসবে যখন বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকার ছড়াছড়ি হবে (৮১: ১১), মানুষ মহাশূন্যে রহস্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে (৮১ : ১২) পৃথিবী তার অভ্যন্তরস্থ সব খনিজ সম্ভার বের করে দেবে (৯৯ : ৩) দাজ্জাল ও ইয়া'জূজ মা'জুজের আবির্ভাব হবে, Genetic Engg-এর আবিষ্কার হবে, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলো আবিষ্কৃত হবে, নূহ (আ.)-এর নৌকা আবিষ্কৃত হবে, নারীদের অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন ওঠবে কেন তাদের জীবন্ত পুঁতে দেয়া হয়েছিল, বিশ্ব যুদ্ধ হবে, আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হবে, দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান আবিষ্কৃত হবে ইত্যাদি। এ ধরনের আরও বহু ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন করীমে মজুদ আছে আগেই বলেছি, এর অনেক পূর্ণ হয়েছে এবং অনেক পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় আছে। মানুষ সময় হলে মহান আল্লাহ্র মহাজ্ঞানের মাধ্যমে এসব সম্বন্ধে জানতে পারবে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ আলোচনা এখানেই শেষ করলাম। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে আর আল্লাহ্ তাআলা তাওফীক দিলে পুস্তকাকারে এসব পাঠকদের খিদমতে পেশ করার প্রত্যাশা রাখি। (চলবে)

সাব জাহাঁ সান চুকে, সারি দু কানেঁ দেখেঁ

ম্যাঁয়ে ইরফান কা এহি ইকহি শীশা নিকলা ॥

(সারা জগতকে মথিত করেছি, সব দোকান দেখেছি,

তত্ত্বজ্ঞানের মদিরার এক মাত্র এ আয়নাটিই বের হলো

– দুররে সামীন)

ইসলামে খিলাফতই মুক্তির একমাত্র সত্য সঠিক সোজা পথ

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

একটি মাসিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাঠ করলাম : "আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে হবে। দুনিয়ায় কম বেশী প্রতিটি অঞ্চলেই মুসলিম জনগণের ওপর দাজ্জালি তান্ডবের বিভীষিকা চলছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মানবজাতির মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ এ সবের মূল উদগাতা ইহুদী জাতি। মানুষের জানা ইতিহাসের গোড়া থেকে তো বটেই, নিকট অতীতের যত দুঃখজনক ঘটনা সে সবেরও মূল হোতা হচ্ছে ইহুদীদের শয়তানী মেধা। উল্লেখ্য যে, ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, 'আর্মাগেডম' আকাশ থেকে নেমে আসবেন এবং ইহুদীদের বৈরী শক্তিকে নির্মুল করে তাদেরকে নিরাপদ করবেন। তাই তারা তাদের ধর্ম মন্দিরগুলিতে এই মর্মে নিয়মিত প্রার্থনা করে থাকে যে, "হে ত্রাণকর্তা 'আর্মাগেড্‌ম' তুমি আগমণ কর। আমরা তোমার আগমণ পথের দিকে চেয়ে আছি। তাদের ধারণা অনুযায়ী এমনটি তখনই হবে যখন বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ পারমানবিক যুদ্ধ শুরু হবে। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এদের কাম্য। এর দ্বারা তাদের সার্বিক বিজয় সাধিত হবে বলে তাদের বিশ্বাস। কিন্তু হাদীস শরীফের খবর অনুযায়ী ইহুদীসহ সকল অপশক্তির কবল থেকে ঈমানদার মানুষদের সুরক্ষার লক্ষ্যেই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। আর ইমাম মাহদীর সহযোগিতা করার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসবেন হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.) । তাদের প্রধান কাজই হবে ইহুদী দানবদের অবদমন। সুতরাং ইহুদী দানবরা মুসলিম উম্মাহর ওপর কি ভয়ানক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে যাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। অতএব আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে আত্মরক্ষার পথ তালাশ করতে হবে। যারা জগতের খোঁজ গত এক দশকের পাশ্চাত্য খবর রাখেন, তাদের ধারণায় এই সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্যের নেতৃস্থানীয় দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যার হার বিস্ময়কর ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার গতি ক্রমেই বাড়ছে। স্থানীয় খ্রীষ্টানদের ইসলাম গ্রহণ এবং মুসলিম অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান এ হার অব্যাহত থাকলে পাশ্চাত্য আর এককভাবে খ্রীষ্টানদের আবাস ভূমিরূপে পরিচিত থাকবে না। এই সম্ভাবনার আতঙ্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যেই ক্রুসেডপন্থী খৃষ্টানরা একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়। আর সেটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মুসলমানদের মধ্যে একটি অস্থিরতা সৃষ্টি করা।"

পবিত্র কুরআন মুসলিম জাতির পথ প্রদর্শক। যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র এই কুরআন মুসলমান জাতির ঘরে ঘরে বিরাজমান। দৈনন্দিন পঠিত হয়, মুখস্থ করা হয়। পথ প্রদর্শক এই কুরআনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানজাতিকে বলেছেন, "তোমরাই বিজয়ী হবে, তোমাদেরই প্রাধান্য রবে যদি তোমরা মু'মিন হও" (আলে ইমরান)। প্রশ্ন এই যে, বর্তমান বিশ্বে প্রাধান্যই বা কাদের, মু'মিনই বা কারা- ইহুদী খ্রীষ্টানগণ অথবা মুসলমানগণ? কুরআন করীমের উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ যদি খাঁটি ঈমানদার মু'মিন হয়, তাহলে শয়তান তাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আমি দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো দিকভ্রান্ত হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কুরআন এবং অপরটি রসূলের সুন্নত।" মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র এই কুরআন পাঠ করে মুখস্থ করে, আলেম ওলেমা পীর মুর্শিদ যাদের মাঝে অগণিত, সারা বছর ধরে ধর্ম সভা, মিলাদ-মাহফিল, ওয়াজ নসিহত করে বেড়ায়, মক্তব, মাদ্রাসা মহল্লায় মহল্লায়, নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জব্রত পালন করে, সুন্নতের নামে লম্বা জুব্বা জামা, আচকান, পায়জামা, লম্বা দাঁড়ি, লম্বা টুপী ইত্যাদি বেশ ভূষণে সাধু সেজে বুক স্ফীত করে চলে, তবুও শয়তান নামক ইহুদী খ্রীষ্টানদের পদানত কেন ? কোন্ সে অপরাধের কারণে? হযরত যিয়াদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ইহা (ইল্‌ম) পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। আমি বল্লাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! ইল্‌ম কিরূপে পৃথিবী ত্যাগ করবে? যেহেতু আমরা কুরআন পড়ি এবং এটা আমাদের সন্তানদেরকে শিখাই এবং আমাদের সন্তানেরা শিখাবে তাদের সন্তানদেরকে, এমনিভাবে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে? উত্তরে হযরত রসূল করীম (সা.) বল্লেন, ওহে যিয়াদ, তোমাকে তো আমি এই শহরের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী লোক মনে করতাম; ইহুদী খ্রীষ্টানগণও তো তৌরাত

ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে। কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করে কি? কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার নীচে প্রবেশ লাভ করবে না। অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম করত: সেই মত কাজ করবে না।" যে বিদ্যা উপকারে আসে না তা এমনি একটি ধনাগার যা থেকে আল্লাহ্‌র পথে কোন হিতকর্মে প্রদান করা হয় না। "তোমরা জান কি যে, কিসে ইসলামের প্রাণ শক্তি শুষে নিয়ে বিনাশ করে? বিদ্বানের ভ্রম এবং কপটচারীর চক্রান্ত। শয়তানের বিরুদ্ধে একজন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্র মুর্খ ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।"

ঈমান এবং আমল খাঁটি মুসলমান হওয়ার লক্ষণ। আমল না থাকলে ঈমানের যেমন কোন মূল্যই নেই, তেমনি ঈমান না থাকলে আমল হয় অর্থহীন। খাঁটি ঈমানদার মু'মিন মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করে পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "যারা তওবা করবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করবে এবং আল্লাহ্‌র 'রজ্জুকে' (খিলাফতকে) শক্তভাবে ধরবে আর শুধু আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে তারাই হবে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত, এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই মু'মিনগণকে মহা পুরস্কার দিবেন" (সূরা নেসা)। উপরোক্ত আয়াতে 'রজ্জু' অর্থে সূরা নূরে বর্ণিত 'খিলাফত' যার মাধ্যমে মুসলমানগণের ঈমান, একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ পরস্পর মহব্বত ও সহানুভূতির বন্ধন অটুট থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার এই নির্দেশকে অমান্য করে যারা খিলাফতকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে চলবে আর যতই নামায, রোযা, হজ্জব্রত পালন করুক না কেন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কখনও তারা ঈমানদার মু'মিন মুসলমান বলে গণ্য হবে না। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মৃত্যু বরণ করবে, সে ব্যক্তি জাহেলিয়তের মৃত্যুবরণ করবে।" (মুসনাদ আহমদ, আহমদ বিন হাম্বল) "যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়আত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়তে মৃত্যুবরণ করেছে" (সহী মুসলিম)। মুসলমান জাতি আজ শিয়া, সুন্নী, ওহাবী চিশতীয়া, কাদেরিয়া, নকশে বন্দীয়া, দেওবন্দ, বেরেলভী, আহলে হাদীস,নানান দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভ্রান্ত। তার পরেও রয়েছে অগণিত পীর মুর্শিদ। তাদের নাই কোন ইমাম বা নেতা, নাই একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ, নাই পরস্পর সহানুভূতি, মুসলমান জাতিকে আল্লাহ্ তাআলা শ্রেষ্ঠতম জাতিরূপে শিক্ষাগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করে উদ্ভব করেছিলেন, তারাই হবে বিশ্ববাসীর শিক্ষাগুরু। ইসলামের আদর্শ শিক্ষায় অন্যান্য সকল জাতিকে গড়ে তুলবে আদর্শবান। আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত করে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা দ্বারা পৃথিবীতে কায়েম করবে শান্তি সুখের স্বর্গীয় আবাসস্থল। কিন্তু আজ আমরা মুসলিম জাতির অবস্থা কি দেখছি? তারা আজ কার কাছে মার না খাচ্ছে? তারা আজ ইহুদী খ্রীষ্টানদের করুণা ভিখারীর পাত্র নয় কী? বড় বড় ডিগ্রী, বড় বড় পদের সনদ আনতে দৌড়ানো হয় ইউরোপ আমেরিকার ইহুদী খ্রীষ্টানদের কাছে। কই, মুসলমান অথবা মক্কা মদীনার পাশ দিয়েও তো তারা ঘেষেনা। সে কোন্ পাপের কারণে? "খোদা একটা জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই না করে" (সূরা রাদ)। অধ:পতিত এইরূপ চরম দুর্দশাগ্রস্থ মুসলিম জাতিকে উদ্ধারকল্পে আল্লাহ্ তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি ও হযরত রসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন, এবং তার মাধ্যমে খিলাফতহীন নেতাবিহীন শতধা বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত পথহারা মুসলিম জাতির মধ্যে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাআতই নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন যোগে আজ ইসলামের সুমহান বাণী বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার কাজে দিবানিশী নিমগ্ন। বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ইসলাম প্রচার, মিশন, মসজিদ, মানুষের সেবায় স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করছে। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের প্রচারকগণেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলেই আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের খ্রীষ্টান ভাই ভগ্নীগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে তাদের জীবনকে ধন্য মনে করছে। আর অন্য দিকে ইসলামের নামধারী আলেম-ওলামা, মুফতি-মাওলানা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন কবে নাগাদ বেহেশ্‌তে গিয়ে পরমা সুন্দরী ললনাগণের পরশ লাভ করবেন।

পবিত্র কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র 'রজ্জুকে' দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। 'রজ্জু' অর্থাৎ খিলাফত, আল্লাহ্ ও মানুষের সংযোগস্থল, মুসলমান জাতির প্রাণ শিরা। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনেন (সেই আলো দ্বারা দেখে তারা

আল্লাহ্‌র সরল পথে চলে) আর যারা অবিশ্বাসী শয়তান তাদের অভিভাবক। শয়তানেরা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় (এবং অন্ধকারে তারা পথ ভ্রষ্ট হয়), (সূরা বাকারা)। "যে ব্যক্তি ঈমান আনে আল্লাহ্ তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সব কিছু সম্যক অবগত" (সুরা তাগাবুন)। "যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে আরো অগ্রসর হওয়ার পথ প্রদর্শন করে থাকি" (সূরা আনকাবুত)। "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, তারপর সে-ই-হয় তার সাথী। তারাই (শয়তানরাই) মানুষকে সুপথে বাধা দান করে, আর (সেসব) মানুষ মনে করে যে, তারা সুপথেই রয়েছে" (সূরা যখরুফ)। "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকেই (আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী করে) এক দলে একই পন্থিতে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করেন। আর জালেমদের জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নাই (তারা আল্লাহ্‌র রহমত ও সুপথ হতে বঞ্চিত হয়)" (সূরা শুআরা)। "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে ব্যক্তি তার অভিমুখী হয়, তিনি তাকে পথ প্রদর্শন করেন না।" "আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না" (সূরা জুমুআ)। "তিনি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং আরশের মালিক। তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা আপন হুকুম মত ওহী পাঠিয়ে দেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তা দ্বারা হাশরের সেই মিলনের দিন সম্বন্ধে মানুষকে হুঁশিয়ার করে দিবেন" (সূরা মুমিন)।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা মানুষ মাত্রই সুপথ গ্রহণের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অমান্য ও অস্বীকার করে ভ্রান্ত পথে চলে যায়, তখন তারা তাদের যোগ্যতা হারিয়ে শয়তানের আয়ত্তাধীনে চলে যায়, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের যোগ্যতা এমনি হীন হয়ে পড়ে যে একটা মিথ্যা ধারণা পোষণ করতে করতে অবশেষে এটা তাদের স্বভাবগত বিশ্বাসে পরিণত হয়।

মানবকূল শ্রেষ্ঠ, রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "আমার উম্মতগণ হুবহু ইহুদী খ্রীষ্টানদের পথ অনুসরণ করবে।" হযরত রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে। ইহুদীগণ বিশ্বাস করে যে তাদের ত্রাণকর্তা 'আর্মাগেডন' আসমান থেকে নেমে এসে শক্তি বলপ্রয়োগে তাদের বৈরী শক্তিকে নির্মুল করবেন। খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস, যীশু (ঈসা আ.) ঈশ্বরের একমাত্র জাতপুত্র। ক্রুশে রক্ত দিয়ে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্য করতঃ স্বর্গে নীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। আবার তিনি নেমে এসে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। মুসলমান জাতির নায়েবে রসূলের দাবীদারগণের বিশ্বাস এই যে, "হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্ব শেষ নবী, তারপরে আর কোন নবী নাই। তিনি মরে গিয়ে মদীনার মাটির নীচে শুয়ে আছেন। কিন্তু খ্রীষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) মরেন নাই। তিনি চতুর্থ আসমানে স্বশরীরে জীবিত আছেন। আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে অজেয় শক্তির বলে কাফেরদের নিধন করবেন। দাজ্জালের কবল থেকে মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করবেন। মহানবী দু'জাহানের উদ্ধার কর্তা হযরত রসূল পাক (সা.) এর পবিত্র বাণী যে আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে ইহুদী খ্রীষ্টান এবং মুসলমান জাতি একই পথের যাত্রী হয়ে বুকে বুক দিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে চলছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি? এটা ক্রুশীয় মতবাদ। এইরূপ ক্রুশীয় কাল্পনিক বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই মুসলমান জাতির আজ চরম অধ:পতন। হাদীস গ্রন্থে এটাকেই বলা হয়েছে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আগমণ করবেন, ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ক্রুশীয় মতবাদের বিলোপ সাধন করবেন। হযরত ঈসা (আ.)এর স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণিত হলে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের স্তম্ভ থাকে না। ইহুদীগণের দাবীও মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ঐশী বাণীপ্রাপ্ত হয়ে অকাট্য যুক্তি ও দলিল প্রমাণাদি দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সাব্যস্ত করেন। কাশ্মীরে তার কবর দেখিয়ে ক্রুশীয় মতবাদের মূল উৎপাটন করে চূর্ণবিচূর্ণ করে মাটির ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমান জাতি তাদের ভ্রান্ত ও কাল্পনিক বিশ্বাসকে অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে নির্মল ও নিস্কলুষ অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে মেনে নিয়ে বান্দার প্রতি দয়াময় আল্লাহ্‌র চিরাচরিত নেয়ামত খিলাফতের আশ্রয়ে সমবেত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের ললাটে মুক্তি নেই। যতই চেষ্টা প্রচেষ্টা করুক না কেন সকলই হবে অনন্ত মরুভূমিতে জল সিঞ্চন করার ন্যায় অর্থহীন। মুক্তি ও ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র পথ আল্লাহ্‌র খিলাফত। আর, খিলাফত ও রাজনীতি এক জিনিষ নয়। ইসলাম যেমন আল্লাহ্‌র মনোনীত বিশ্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম তদ্রুপ ইসলামে খিলাফত বিশ্বজনীন আল্লাহ্‌র রহমত। এটি কোন দেশ জাতি বা কোন দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। খিলাফতের নাম ভাঙ্গিয়ে যারা রাজনীতি করে তারা মানুষের সাথে ধোকাবাজি করে। আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দিয়ে তারা কখনো সফলকাম হতে পারবে না।

ইবাদত ও দোয়া পরস্পর সম্পৃক্ত

মিলা পাটোয়ারী

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা যারিয়াতের ৫৭ নম্বর আয়াতে বলেছেন ঃ

"ওয়ামা খালাক্বতুল জ্বিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়াবুদুন্'।

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' সাধারণ হোক বা অসাধারণ হোক সব মানুষকে ইবাদত করতে হবে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কুরআনের ভাষায় "আশরাফুল মাখলুকাত।" মহান আল্লাহ্ তাআলা এই সেরা জীবকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এ পৃথিবীতে যত প্রকার ইবাদত বা উপাসনার পদ্ধতি রয়েছে এর সম্মিলিত ও পরিপূর্ণরূপ হলো নামায।

নামায হলো ইবাদতের ভিত্তি। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

'আস্‌সালাতু ইমামুদ্দীন' অর্থাৎ নামায ধর্মের স্তম্ভ। স্তম্ভ বা খুটি ছাড়া যেমন অট্টালিকা বা ঘর নির্মিত হতে পারে না তেমনি নামায ছাড়া ধর্ম হতে পারে না। সুতরাং আধ্যাত্মিক সফরের দিক থেকে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম।

নামায সময় মত আদায় করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা নিসা ১০৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন :

"নিশ্চয় মু'মিনদের জন্য নামায সময় মত পড়া ফরয করা হয়েছে।"

নামাযের জন্য দিনে পাঁচবার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই সময় মত নামায পড়া আবশ্যক।

নামায সম্পর্কে আহমদীয়া জামাআতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, নামায খুব যত্ন সহকারে পড়া উচিত। সকল উন্নতির মূল চাবিকাঠি নামায।

আঁ হযরত (সা.) নিজে বলেছেন - 'কুররাতু আয়নি ফিস্‌সালাতি।" 'আমার চোখের স্নিগ্ধতা বা প্রশান্তি আমার নামাযের মধ্যে।'

প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি যখন এ রকম মর্যাদা লাভ করে তখন তার সকল প্রকার আনন্দ, তার মনের প্রকৃত প্রশান্তি হয়ে যায় তার নামায। আঁ হযরত (সা.)-এর উপরোক্ত বাণীর অর্থও এটাই। সুতরাং মানুষ আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে হতে নফসের উত্তেজনা হতে মুক্তি পেয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়। (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৫)

এ জাগতিক জীবনের সকল পেরেশানী ও অস্থিরতা হতে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো নামায। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন, "আস্‌সালাতু মিরাজুল মু'মি-নীন।" অর্থাৎ, নামায মু'মিনের মিরাজস্বরূপ। নামাযের মাধ্যমে মানুষ ধাপে ধাপে আল্লাহ্‌র দিকে এগুতে থাকে। এভাবে এক সময় আল্লাহ্ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়ে যায়। এভাবে নামাযী শহীদের মাকামও লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন ঃ

"অতএব জীবনে শাহাদাত লাভ করার তত্ত্ব নামায শিখায়। নামায জীবনের কেবল মাত্র শাহাদাত লাভ করার তত্ত্বই শিখায় না বরং বলে দেয়, অবশ্যই তোমার শাহাদাত লাভ করার সৌভাগ্য হবে। সুতরাং সেই নামায যার মাধ্যমে খোদা অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হয়ে যান। যেই নামায বা আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাহকে অদৃশ্য জগৎ থেকে দৃশ্যমান জগতে অবতরণ করে দেয় সেই নামাযই শাহাদতের মাকাম ও মর্যাদা রাখে। আর সেই নামাযই নামাযিকে শহীদ বানিয়ে দেয়।" (জুমুআর খুতবা, ১৩-১২-১৯৮৫)

নামায তথা ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে বিরোধাত্মক শক্তি সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক যাত্রা পথে যথেষ্ট অবদান রাখে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আন কাবুতের ৪৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে দুরে রাখে।'

আসলে মানুষ অশ্লীল ও অবাধ্য হলেই পাপ কাজে সাহসী হয়। নামায আধ্যাত্মিক গোসল স্বরূপ। আধ্যাত্মিক যাত্রা পথে নামায এক স্নেহময়ী মায়ের মত, প্রকৃত নামায নামাযীর আত্মার সব নোংরা ময়লা কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে বলতে শুনেছি, "তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারো দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত থাকে এবং সে এতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার দেহে কি কোন ময়লা থাকবে? সাহাবা (রা.) বল্লেন, না, তার দেহে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি (সা.) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায হলো এর দৃষ্টান্ত। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা পাপ মুছে দেন"। (বুখারী ও মুসলিম)।

অতএব, নামায এভাবে মু'মিনকে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে করতে আধ্যাত্মিক মঞ্জিলের প্রতি এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ক্রমাগত সংশোধনের মাধ্যমে তাকে প্রথমে নীতিবান মানুষ এবং পরে আল্লাহ্ তাআলার মানুষে পরিণত করে।

নামায প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, (হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত) 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ

কথা বলবো না - যাদ্বারা আল্লাহ্ তাআলা পাপ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবা (রা.) আরয করলেন ইয়া রসূলুল্লাহ্! অবশ্যই বলুন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, (শীত ইত্যাদি কঠিন মওসুমের কারণে) মন না চাইলেও ভাল করে ওযু করা, দুর থেকে মসজিদে হেঁটে আসা, এক নামাযের পর পরের নামাযের অপেক্ষা করা, এটিও সীমান্তে পাহাড়ার জন্য ক্যাম্প করার মত কাজ। একথা আঁ হযরত (সা.) দু'বার বললেন।" (মুসলিম, কিতাবুল তাহারাহ্, বাব ফাজলু ইসবাগুল ওযু আলা মাকারিহি)

সুতরাং আমরা যখন আমাদের অন্তরে সীমান্ত প্রহরাক্যাম্প স্থাপন করব তখন শয়তানের আক্রমণ হতে বাঁচতে পারব। নতুবা শয়তান সেতো চ্যালেঞ্জ দিয়েই রেখেছে যে, সে প্রত্যেক পথ দিয়ে আক্রমণ চালাবে। সঠিক অর্থে নামায আদায় করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন : "সেই নামায যা আঁ হযরত (সা.) শিখিয়েছেন তা পড়ার কারণে মানুষ খোদার প্রকৃত বান্দা বলে গণ্য হয়। পাপ তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। দোয়া কবুল হয়। মানুষ খোদার নৈকট্য লাভ করে (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৫৬)।

হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর মুখে খাবারের এক গ্রাস উঠিয়ে দেয় তাও তার জন্য ইবাদত (বুখারী)। মোট কথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই হলো মুখ্য ও আসল কথা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মানুষের জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু দোয়ার গুরুত্ব কতটা?

নবী করীম (সা.) বলেছেন, **'আদ্দুআউ মুখ্কুল ইবাদাত'** 'দোয়া ইবাদতের মূল।' অর্থাৎ দোয়া হলো ইবাদত এবং ইবাদতের মূল হলো দোয়া। দোয়া ছাড়া ইবাদত নিষ্প্রাণ।

দোয়া সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

"দোয়া কি? আল্লাহ্ এবং তাঁর সরল পুণ্যবান বান্দার মাঝে পারস্পরিক সুলভ ইতিবাচক সম্পর্কের নাম দোয়া। আল্লাহ্র করুণা ও কল্যাণ বান্দাকে আল্লাহ্র দিকে আকর্ষণ করে। বান্দার কৃতজ্ঞতা ও দোয়ার মাধ্যমে এ সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে এবং এমন এক বিশেষ রূপ ধারণ করে যা এক আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে।" (বারাকাতুদ্দোয়া)

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে সূরা মু'মিন এর ৫১ নং আয়াতে বলেছেন : উদুনী ইয়াস্তা জিবলাকুম।' অর্থ, তোমরা আমার কাছে সারা দিন দোয়া কর।

আবার সূরা বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন, "আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর (দোয়াকারীর) প্রার্থনার উত্তর দেই। যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে"।

হাদীস পাঠেও আমরা জানতে পারি যে, আঁ হযরত (সা.) দোয়ার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর জিনিষের জন্যও তিনি (সা.) আল্লাহ্ তাআলার দোয়া প্রার্থী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় আঁকা মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা কর। এমনকি জুতার ফিতার জন্যও"। (তিরমিযী)।

এ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.) আরো বলেছেন 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভূ জীবিত ও দয়ালু। কোন বান্দা তার নিকট হাত তুললে তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (তিরিমিযী, আবুদাউদ)

নবী করীম (সা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ দোয়াকারী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে, তাহাজ্জুদের নামাযে, নফল ইবাদতের সিজদায়, রুকূতে, দাঁড়িয়ে বসে এত অধিক দোয়া করতেন যে, দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো ও রুকূতে থাকার কারণে তাঁর পা ফুলে যেত। এ ছাড়া সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে দোয়া করেছেন, যা হাদীসে দোয়া হিসেবে মানুষের জন্য অমূল্য সম্পদ ও পাথেয় হয়ে রয়েছে।

হযরত উমর (রা.) রেওয়ায়াত করেন, আমি উমরার জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিন অনুমতি প্রদান করলেন, আর বললেন, 'হে আমার ভাই! আমাদেরকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেওনা।" উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা ছিলেন তিনি, যিনি সমস্ত জাহানের জন্য দোয়া করতে থাকেন আজীবন, পূর্ববর্তীদের জন্য ও পরবর্তীদের জন্যও এবং কিয়ামতকাল অবধি, যার দোয়া সমূহ হচ্ছে আমাদের পূঁজি। তাঁর বিনয়ের মোকাম ও মর্যাদা লক্ষ্য করুন। তার অমায়িকতা দেখুন। হযরত উমর (রা.)কে বললেন, 'হে আমার ভাই! নিজের দোয়াতে আমাদের কথা ভুলে যেওনা। তখন হযরত উমর (রা.) বলছেন, হুযুরের কথায় আমি এত আনন্দ বোধ করি যে, এর বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়া আমি পেয়ে যাই তবুও ততোটা আনন্দ বোধ করবো না। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

হযরত উমর (রা.) এজন্য খুশী হয়েছিলেন, তিনি (রা.) জানতেন যে হুযূর (সা.) দোয়ার জন্য বলায় এতে একটি সুসংবাদ নিহিত ছিল যে, তার (রা.) দোয়া কবুল হবে, এর মোকাবেলায় যদি সমস্ত দুনিয়া পেতেন তাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। আমরা জানি আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পঞ্চম খলীফা আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর

আনোয়ার (আই.) দোয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, 'দোয়া করুন, অনেক বেশি দোয়া করুন।' তাই আমাদের জানা দরকার দোয়া কি?

দোয়া শব্দের অর্থ-প্রার্থনা, চাওয়া বা ডাকা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্ তাআলার বান্দা অতি বিনয়ী হয়ে যখন কোন কিছু পাওয়ার আশায় তাঁর স্রষ্টার সমীপে প্রার্থনা করে তখন এটাকে দোয়া বলা হয়। হাদীস শরীফে আছে, 'দোয়া হলো ইবাদতের সারবস্তু।' আবার সূরা ফাতিহাকে দোয়া বা শ্রেষ্ঠ দোয়া বলা হয়েছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো নামাযকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়া বলেছেন। যেমন তিনি (আ.) বলেছেন, "নামায কি? ইহা এক প্রকার দোয়া, যা তসবীহ, তাহমীদ, তকদীস, তাহলীল ও দুরূদ স্রষ্টার সমীপে সবিনয়ে প্রার্থনা করা। (কিশতিয়ে নূহ্)।

এসব আলোচনা থেকে বলা যায়, দোয়া হলো স্রষ্টার সাথে বান্দার যোগসূত্র বা বাক্যালাপের এক অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম।

যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহে মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) দোয়ার প্রতি এত গুরুত্বারোপ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "দোয়ার মধ্যে, আল্লাহ্ তাআলার আধ্যাত্মিক শক্তি রেখেছেন, যা কিছু হবে দোয়া দ্বারাই হবে। আমাদের হাতিয়ার তো দোয়াই। দোয়া ব্যতিরেকে আর কোন অস্ত্র আমাদেরকে দেয়া হয়নি।"

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন ঃ

'অর্থাৎ, অসম্ভবকে এটা (অর্থাৎ দোয়া) সম্ভব করে দেখায়, হে আমার দার্শনিক বৃন্দ! দোয়ার শক্তি দেখাবে কি?

নামাযের মধ্যেই দোয়া কবুল হওয়ার মোক্ষম সময়, বিশেষ করে যখন আমরা সেজদারত থাকি। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যখন কোন বান্দা সেজদায় থাকে, তখন সে আল্লাহ্ তাআলার অতি নিকটে থাকে। সুতরাং তখন বেশী করে দোয়া কর"। (মুসলিম) এ ছাড়া দোয়া কবুল হয় জুমুআর দিনে, সুবহে সাদিকের পূর্বে, রমযান মাসে, লায়লাতুল কদরে, আরাফাতের দিনে, ইফতার করার সময়ে, অসুস্থ অবস্থায়, সফরকালীন সময়ে, আযান ও একামতের মর্ধবর্তী সময়ে, বৃষ্টিপাতের সময়ে, জেহাদের ময়দানে, এবং যুলুম ও অত্যাচারের বরদাশ্তকালীন ধৈর্য্য ধারণের সময়ে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মনে রাখবে দোয়া সেই অস্ত্র যা এ যুগে বিজয় লাভের জন্য আমাকে আকাশ হতে দেয়া হয়েছে। আর হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা কেবল এ দোয়ার অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধে জিততে থাকো' (তাজকেরাতুস শাহাদাতাইন)।

তাই আহমদী জামাআত তরবারীর জেহাদ বিশ্বাস করে না। আহমদীয়া জামাআত শান্তি ও প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ও দোয়ার মাধ্যমে বিশ্ব বিজয় নিয়ে আসবে। আমাদের বর্তমান বিশ্ব ইমাম ও খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) খিলাফতের মসনদে নির্বাচিত হয়েই জামাআতকে দোয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) বলেছেন : নেকী ব্যতিত অন্য কোন জিনিস বয়স বৃদ্ধি করে না এবং দোয়া ছাড়া বিধি লিপি পবিবর্তন করা যায় না এবং মানুষ তার কৃত কর্মের জন্যই রিয্ক থেকে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজাহ্), এক রেওয়ায়েতে আছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া ব্যতীত বেশী সম্মানের যোগ্য আর কিছু নেই। (তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত নবী করীম (সা.) আরো বলেছেন, রাতের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ যখন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা নিচের আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, কেউ কি আমার কাছে কিছু চায় যে তাকে দেয়া যায়? কেউ কি কোন দোয়া করে যে তার দোয়া কবুল করা হয়? কেউ কি তার পাপের ক্ষমা চায় যেন তাকে ক্ষমা করা হয়? এমন অবস্থা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বিরাজমান থাকে। সুতরাং তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়ানো খুবই প্রয়োজন। তাহাজ্জুদ নামায হলো দোয়ার এক বিশেষ মাধ্যম। বিশ্ব চরাচর যখন কোলাহল মুক্ত থাকে, বান্দা তখন একান্ত ভাবে খোদার সমীপে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে দোয়ায় রত হয়ে থাকে। বিগলিত চিত্তে তার মনের সব কিছু ব্যক্ত করে এ সময় আল্লাহ্ তাআলা বান্দার অনেক নিকেট চলে আসেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন : "আমাদের জামাআতের লোকদের তাহাজ্জুদ নামাযকে অবশ্য করণীয় করে নেয়া আবশ্যক। বেশী না হোক দু'রাকাতই যেন পড়ে নেয়। কেননা, এতে তার দোয়া করার সুযোগ লাভ হয়ে যাবে। এ সময়ে দোয়ার একটি বিশেষ প্রভাব হয়ে থাকে। কেননা, এটা প্রকৃত ব্যথা ও প্রকৃত আবেগ সহ বের হয়ে থাকে। একটি বিশেষ জ্বালা ও বেদনা যতক্ষণ সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ এক ব্যক্তি সুখ নিদ্রা ছেড়ে কিভাবে জাগ্রত হতে পারে? অতএব, এ সময়ে জাগ্রত হওয়াটাই একটি মর্মপীড়া সৃষ্টি করে দিয়ে থাকে। এতে দোয়ায় একটি ভাবাবেগ ও উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু শিথিলতা ও অমনোযোগিতা নিয়ে জাগ্রত হলে এটা সুস্পষ্ট যে, সেই ব্যথা ও জ্বালা অন্তরে থাকে না। কেননা, ঘুম তো দু:খ কষ্ট দূর করে দিয়ে থাকে কিন্তু ঘুম থেকে যখন জাগ্রত হয়, তখন মনে ঘুম থেকে ব্যথা ও বেদনা অধিক থাকে, যা তাকে জাগ্রত করেছে। আঁ হযরত (সা.) সব সময় বেশি বেশি নফল নামায আদায় করতেন। তিনি আট রাকাআত

নফল এবং তিন রাকাআত বিতের নামায পড়তেন। কখনও একই সময়ে এগুলো পড়ে নিতেন আবার কখনও কখনও এভাবে আদায় করতেন যে, দু'রাকাত পড়তেন এবং ঘুমিয়ে যেতেন। মোট কথা ঘুমুতেন আবার উঠতেন। এভাবে নফল আদায় করতেন।" (আল হাকাম, এপ্রিল ১৯০৩, ফতওয়া মসীহ্ মাওউদ (আ.) পৃঃ ৮১)

দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন ঃ "মনে রাখা দরকার, বিনয় ও কাতরতাই দোয়ার একমাত্র শর্ত নয়। অন্যান্য বহু শর্ত রয়েছে। যেমন ধর্মভীরুতা, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, সংশয়াতীত অটল বিশ্বাস, খোদা প্রেম, একাগ্রচিত্ততা ও গভীর অভিনিবেশ ইত্যাদি। (বারাকাতুদ্দোয়া)

'যখন তুমি দোয়ার জন্য দন্ডায়মান হও তখন তোমার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তোমার খোদা সব কিছুর ওপর শক্তিশালী। তবে তোমার দোয়া গৃহিত হবে এবং তুমি খোদার কুদরতের আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখবে। (কিশতিয়ে নূহ্ পৃঃ ৪২)

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন :

দোয়া ইবাদতের মগজ (সারবস্তু) বিশেষ। (তিরমিযী) তাই তো নবী করীম (সা.) রাতে ঘুমানোর দোয়া, ঘুম থেকে জেগে দোয়া এবং প্রত্যুষে দোয়া পাঠের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের কাজ শুরু করতেন। সারা দিন যেসব কাজ করতেন তার পূর্বেও দোয়া করতেন, তিনি (সা.) কোন কাজেই দোয়া ব্যতিরেকে করতেন না । আঁ হযরত (সা.)-এর কয়েকটি দোয়ার নমুনা উল্লেখ করছি। যেমন : ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া, নতুন কাপড় পড়ার দোয়া, রুগী দেখার দোয়া, বিয়েতে বর কনেকে দোয়া, বৃষ্টির জন্য দোয়া, নতুন ফল খাওয়ার পর দোয়া, বিদ্যুৎ চমকানোর সময়ে দোয়া, উঁচু স্থানে উঠা ও নামার দোয়া, হাঁচি দেওয়ার পর দোয়া, রোযা খুলার দোয়া, নতুন চাঁদ দেখার দোয়া, কদরের রাতের দোয়া। এভাবে দোয়া করেই তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট অধিক সম্মানিত হয়েছেন।

দোয়া অনেক শক্তি রাখে। অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখায়। সত্যি বলতে কি দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তাই তো যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কল্যাণমন্ডিত সেই বন্দী, যে দোয়া করে ক্লান্ত হয় না। কেননা একদিন সে মুক্তি পাবে, কল্যাণমন্ডিত সেই অন্ধ, যে দোয়াতে শৈথিল্য দেখায় না, একদিন সে দেখতে শুরু করবে.......কল্যাণমন্ডিত সে যে কবরে পড়ে দোয়ার সাথে খোদা তাআলার সাহায্য চায়, কেননা একদিন কবর হতে তাকে বের করা হবে। কল্যাণ মন্ডিত তুমি যখন তুমি দোয়া করে ক্লান্ত হও না এবং দোয়ার জন্য আত্মা বিগলিত চিত্তে, অশ্রুসিক্ত চোখ এবং বুকে এক আগুন সৃষ্টি করে দেয় আর তোমাকে একাকিত্বের স্বাদ উঠানোর জন্য অন্ধকার কুঠরীতে বা নির্জন জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং তোমাকে ব্যাকুল ও নিজ থেকেই দ্রুতগামী বানিয়ে দেয়। কেননা অবশেষে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" (লেকচার সিয়ালকোট, পৃঃ ২৬-২৭)

দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন : 'দোয়ার উদাহরণ একটি সুপেয় পানির ঝরনার মত। যার পাড়ে একজন মু'মিন বসে আছে যখন মন চায় যেখান থেকে পানি পান করতে পারে। পানির মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না দোয়ার সঠিক স্থান নামায। নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় মু'মিন যে স্বাদ লাভ করে এক জন প্রচন্ড বিলাসী ব্যক্তি কোন পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে এত আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। দোয়ার মাধ্যমে সব চেয়ে বড় যা লাভ হয় তা হলো আল্লাহ্‌র নৈকট্য। একজন মানুষ দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছাকাছি চলে যায়। এবং তিনি তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যান। মু'মিন যখন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দোয়ার মাঝে পুরোপুরি বিমোহিত হয়ে যায়। এমনকি পরিবেশের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আল্লাহ্‌র কৃপা তার জন্য সৃষ্টি হয় এবং তিনি তার অভিভাবক হয়ে যান। (তার সমস্ত কাজ আল্লাহ্ নিজ হাতে নিয়ে নেন) মানুষ যদি নিজ জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে শুনতে পারবে যে আল্লাহ্ যদি কারো অভিভাবক না হন তবে তার জীবন বড় দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।" (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৫৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমনই একজন মানুষ যিনি দোয়া করে কখনই ক্লান্ত হতেন না। তাঁর জামাআতভুক্ত আহমদীদেরকেও তিনি দোয়া করতে শিখিয়েছেন। তার অবর্তমানে তার খলীফাগণ একই ভাবে দোয়ার মাধ্যমে এবং ইসলামের শিক্ষাকে পাথেয় করে সমগ্র বিশ্বে এর সৌন্দর্যকে তুলে ধরছেন। নিজেদের চেষ্টা ও পরিশ্রম বাস্তবায়নের জন্য আহমদীগণ দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে এবং দোয়ার বরকতেই ক্ষুদ্র একটি গ্রাম কাদীয়ান থেকে ইসলামের যে প্রচার কাজ শুরু হয়েছিল তা এখন সমগ্র বিশ্বে ব্যপ্তি লাভ করেছে। আহমদীগণ সগৌরবে ইসলামের সৌন্দর্যকে প্রসার ঘটিয়েছে এবং আল্লাহ্ তাআলা একে শক্ত ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ্)। দোয়া যে কত বরকতময়, শক্তিশালী, ফলদায়ক এবং কার্যকর তার বাস্তব নমুনা পৃথিবীতে প্রদর্শণ করেছে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত।

'রাব্বিজ আলনী মুক্বীমাস্ সালাতি ওয়ামিন যুররিয়্যাতি রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল দুআ'। অর্থাৎ হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী কর। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আর আমার দোয়া কুবল কর। আমীন (তা-ই যেন হয়)।

ইসলামে খিলাফত

মূল ঃ ফরিদ আহমদ (যুক্তরাজ্য)
অনুবাদ ঃ জামালউদ্দীন আহমদ সৌরভ

(৩য় কিস্তি)

প্রতীক্ষিত নবী

প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য নবুওয়্যত এক বদান্যতা। কিন্তু কিছু মনোনীত ব্যক্তি ব্যতীত কারো পক্ষে এটা অর্জন করা সম্ভবপর নয়। মহানবী (সা.) এর নিকট সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম অবতীর্ণ করে আল্লাহ্ তাআলা এটা নিশ্চিত করেছেন যে, এই উম্মাহ্'র জন্য নতুন কোন নবী আসবে না, নতুন কোন ধর্মও প্রয়োজন হবে না। শুধু পুনরুদ্দীপ্ত করার জন্য সংস্কারক আবির্ভূত হবেন। যেভাবে ঈসা (আ.) মূসায়ী শরীয়তের একজন নবী হয়েছিলেন, সেভাবে পরবর্তীকালে একজন নবী হবেন যিনি ইসলামের খাঁটি সেবক ও মুহাম্মদ (সা.) এর পরম অনুগত এবং খলীফা হবেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়্যতের মর্যাদা দান করেন। এর অন্যথা আল্লাহ্ তাআলার কার্যপদ্ধতি নয়।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের পরবর্তী সময়ে নবুওয়্যতের দাবিদার এবং মসীহ্ (কোন মুসলিম বর্ণনা মতে মাহদী) হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) (১৮৩৫-১৯০৮) তিনি একজন সম্ভ্রান্ত এবং ধার্মিক মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর শক্তিশালী লিখনীর মাধ্যমে, যেমন বারাহীনে-ই-আহমদীয়া, মুসলমানদের উদ্দীপ্ত করেছেন এবং ইসলামে নতুন এক দিন উপস্থাপন করেছেন। জীবন্ত ধর্ম হিসেবে ইসলাম শুধু মুসলমানদের নয় বরং সকলের পরিত্রাণের উপায়, যারা এর থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে চায়। তা আবার নতুন করে মানুষ বুঝতে শুরু করে। ইসলামের পক্ষে তিনি আশিটির বেশী পুস্তক রচনা করেন। তিনি সেই সাথে সেসব মুসলমানের সমালোচনা করেন যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে সরে গিয়েছিলো। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো অসৎকর্ম দূর করে সৎকর্ম এবং খাঁটি ইসলামের পুনরুজ্জীবন করা।

পূর্ববর্তী নবীগণের মত তিনিও ঐশী বাণী বা ওহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের এত বড় যোগ্যতার অধিকারী মনে করেননি এবং তাই এ সম্বন্ধে দাবিও করেননি। তিনি নিজেকে ইসলামের একজন যথার্থ অনুসারী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সেবক হিসেবেই মনে করতেন। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে ক্রমাগত ওহীর ফলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইলো না যে, তিনি মসীহ্ ও মাহদী এবং ইসলামের পরবর্তী সময়ের নবী। তিনি তখন আহমদীয়া মুসলিম জামআতের প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ছিল তাঁর বিশ্বাস। ফলে যে কোন কঠোরতার মুখোমুখি হতে তিনি পরোয়া করতেন না। আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়েই এখন তিনি শায়িত।

নিম্নোক্ত লেখনীর মাধ্যমে তাঁর নবুওয়্যতের দাবি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন :

'প্রায় ১৫০ টির মত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে কিভাবে আমি আমার প্রতি নবী বা রসূল খেতাব অস্বীকার করতে পারি? যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজে আমাকে তা প্রদান করেছেন, তখন তাঁকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে ভয় করবো কেন? আমি আল্লাহ্‌র নামে ঘোষণা করছি যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন – যারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা অভিশপ্ত – তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে প্রেরণ করেছেন।' *(এক গল্‌তি কা ইযালাহ্, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১২০)*

'আমার জীবন যার হাতে সেই আল্লাহ্‌র নামে ঘোষণা করছি যে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং নবী উপাধি প্রদান করেছেন। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলেছেন, এবং এর সত্যতার অসাধারণ নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন, যার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২২, পৃষ্ঠা ৫০৩)

ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী তার নবুওয়্যতের দাবীর পক্ষে আরো অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তিনি এটাও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন যে তার নবুওয়্যত মুহাম্মদ (সা.) এর থেকে স্বতন্ত্র নয় বরং তিনি মহানবী (সা.)-এর একজন অনুগত দাস। খাতামান্নাবীয়িন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি তাঁর পরম বিশ্বাস ছিলো এবং প্রতি মুহূর্তে তিনি মহানবী (সা.) এর মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এবং তিনি এটাও বলেছেন, যে ঐশী নিদর্শন তিনি লাভ করেছেন তা একমাত্র মহানবী (সা.) এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং আস্থার ফলস্বরূপ। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন মানবজাতির প্রকৃত শান্তি লাভের একমাত্র পন্থাই হচ্ছে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)।

তিনি উল্লেখ করেন ঃ

'আমার পূর্বের নবীগণের মত আমিও আল্লাহ্'র অশেষ রহমত লাভ করছি এবং তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে আমার নিজের কোন কৃতিত্বে নয়। এবং তা সম্ভব হতো না যদি না আমি আমার প্রভু এবং কর্তা, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত মহানবী (সা.)-এর পথ অনুসরণ না করতাম। তাই, যা কিছু আমি অর্জন করেছি শুধুমাত্র এই পথ অনুসরণ করে। আমার জ্ঞান থেকে আমি বুঝতে পারছি – মহানবী (সা.) কে অনুসরণ না করে আল্লাহকে লাভ করা যায় না এবং প্রকৃত উপলব্ধিও করা যায় না। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২২, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫) (চলবে)

[রিভিউ অব রিলিজিয়ন্‌স্ অক্টোবর ২০০৭ সংখ্যা]

জ্ঞান-জিজ্ঞাসা

দারুল ইফতা থেকে প্রাপ্ত দুইটি ফতোয়া প্রকাশ করা হলো। ফতোয়া প্রদান করেছেন মোহতারাম মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব–মুফতি সিলসিলাহ্, রাবওয়া। অনুবাদ করেছেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন (মুরব্বী সিলসিলাহ্)। দারুল ইফতা থেকে ফতোয়াগুলো আনিয়েছেন মোহতারাম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব–মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ। তিনি সদয় চিত্ত হয়ে অনুবাদও দেখে দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি আমাদের জলসায় অংশ নিয়েছিল। আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফেরৎ এসেছিল। একবার আমাদের মসজিদে তবলীগ শুনার পর বয়আতের নিয়্যত করেছিল। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে। তার ৪ ছেলে আহমদী। দু'জন আমেরিকাতে চলে গেছে, দু'জন ঢাকাতে রয়েছে। সন্তানদের আকাঙ্ক্ষা তাদের পিতার গায়েবে জানাযা যেন পড়ানো হয়। এ ব্যাপারে নির্দেশনা কি?

ফতোয়া ঃ উত্তর হলো যদি ঐ ব্যক্তি বয়আতের নিয়্যত করে থাকে, আর তা প্রকাশও করে থাকে, তাহলে খোদার দরবারে সে আহমদী হিসেবে গণ্য হবে। ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত–কর্মফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এ রকম লোকের গায়েবে জানাযার নামায পড়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ খিলাফত জুবিলীর Logo- যাতে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ আছে সেটা কোন গেঞ্জী বা শার্টের গায়ে ছাপিয়ে পরা যাবে কিনা? সাধারণত খিলাফত জুবিলীর Logo আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে স্টেইজের ব্যানারে ব্যবহার করা হয়। যাতে কুরআনের আয়াত পিঠের পিছনে থাকে। এ রকম করাতে কুরআনের আয়াতের অবমাননা হয় কি না?

ফতোয়া ঃ উত্তর হলো খিলাফত জুবিলীর Logo -তে আয়াত বা এর অনুবাদ লিখার উদ্দেশ্য হলো –যেন এটা দৃষ্টিপটে থাকে, আমাদেরকে ঐ বিষয় স্মরণ করাতে থাকে যা এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। যেন যে বিষয়ের দিকে এ আয়াত তাকিদ করছে ঐ দায়িত্ব পালনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। Logo ছাপমারা টি শার্ট যিনি পড়েন তার দৃষ্টির আড়ালেই এ বিষয়টি থেকে যায়। যার ফলে এ উদ্দেশ্যের সেখানে মৃত্যু ঘটে। কাপড়ের ব্যাপারে ততটুকু সাবধানতা অবলম্বন সম্ভব হয় না যতটুকু বই পুস্তক, সাজসজ্জার সামগ্রী ও অন্যান্য বস্তুর ওপর অঙ্কিত Logo-এর ক্ষেত্রে করা সম্ভব হয়। তাছাড়াও কাপড়ের উপর ঘাম ইত্যাদি লাগার কারণে আয়াতের অবমাননার সম্ভবনা থেকে যায়। এ জন্য কাপড়ের উপর কুরআনের আয়াত লিখা এর পবিত্রতার পরিপন্থী।

ব্যানার ইত্যাদির মধ্যে আয়াত লিখার ক্ষেত্রে পারত পক্ষে চেষ্টা করা উচিত আয়াত সম্বলিত ব্যানার যেন উঁচু জায়গায় লাগানো হয়। যাতে তার দিকে পিঠ প্রদর্শন না হয়। তবে অপারগতার ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে।

হযরত উমর (রা.) বায়তুল মালের ঘোড়ার উপর "আল্লাহ্" শব্দ লিখেছিলেন। সুতরাং মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ সাকাফি বর্ণনা করেন – "হযরত উমর (রা.)-এর নিকট কুফাতে "আরা" নামক স্থানে চার হাজার ঘোড়া ছিল। যেগুলোর উরুতে লিখা ছিল "ফি সাবিলিল্লাহ্"। (মুসাফ ইবনে আবি শোয়বা, কিতাবুল জিহাদ, বাব মা কালু ফি সিমতে দাওয়া বিল গাযবে, ১২ খন্ড, পৃ-৩৬১ রেয়ায়াত নম্বর-১৩০৯৮)

এই বর্ণনা কনযুল উম্মাল-এর 'ফা' শব্দের প্রেক্ষাপটে কিতাবুল ফাযায়েল, ফাযায়েলুল ফারুক রাযী আল্লাহু আনহু-র ৩৩৭৬৯ নম্বরেও এ পরিবর্তনের সাথে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত উমর (রা.) ঘোড়ার উরুতে হাবিসুন এ শব্দ লিখা ছিল।

হযরত উমর (রা.) লোকদের ব্যক্তিগত মালিকানাধিন পশুপালকে বায়তুল মাল এর প্রাপ্ত পশুপাল থেকে পৃথক করার জন্য সনাক্ত করার সুবিধার্থে অপারগতায় এগুলোর উরুতে "আল্লাহ্" শব্দ লিখিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় অপারগতার মুহূর্তে এমন করা যেতে পারে।

নোট ঃ মুফতি সাহেবের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা এ কথা বুঝা গেল গেঞ্জী ও টি শার্টে কুরআনের আয়াত ছাপানো ঠিক নয়। স্টেজ ও ব্যানারে ছাপানো যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভর্তি ফরম সংগ্রহ ও জমাদানের তারিখ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ফরম সংগ্রহ	জমাদানের শেষ তারিখ
IBA(DU)	৬-১০-০৮ হতে	২৬-১০-০৮ পর্যন্ত
BUET	১৪-১০-০৮ হতে	৩০-১০-০৮ পর্যন্ত
KUET	১৯-১০-০৮ হতে	১৪-১১-০৮ পর্যন্ত
CUET	২০-১০-০৮ হতে	১০-১১-০৮ পর্যন্ত
RUET	২১-১০-০৮ হতে	৪-১১-০৮ পর্যন্ত
MIST	১৪-১০-০৮ হতে	১২-১১-০৮ পর্যন্ত
ঢাকা টেক্সটাইল	১১-১০-০৮ হতে	২৩-১০-০৮ পর্যন্ত
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়	২-১১-০৮ হতে	২০-১১-০৮ পর্যন্ত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৫-১০-০৮ হতে	৩০-১০-০৮ পর্যন্ত
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২০-১০-০৮ হতে	২-১২-০৮ পর্যন্ত
হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়	২০-১০-০৮ হতে	১০-১১-০৮ পর্যন্ত
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০-১০-০৮ হতে	২-১১-০৮ পর্যন্ত
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১২-১০-০৮ হতে	২৭-১০-০৮ পর্যন্ত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯-১০-০৮ হতে	১-১১-০৮ পর্যন্ত
গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ	১৫-১০-০৮ হতে	২৫-১২-০৮ পর্যন্ত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	২-১১-০৮ হতে	১৮-১১-০৮ পর্যন্ত
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৭-১০-০৮ হতে	২৫-১১-০৮ পর্যন্ত
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	২৫-১০-০৮ হতে	৩০-১১-০৮ পর্যন্ত

জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

ডেস্ক নিউজ ঃ হোসনে মোবারক

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত,খুলনার বায়তুর রহমান মসজিদে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

ক) ‘আহ্বান’ ও ‘রাজ-ই হাকীকাত’ ও ‘হাকীকাতুল মাহদী’ পুস্তকের উপর আলোচনা সভা

গত ২৮/০৬/২০০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ ‘আহ্বান’ পুস্তকের উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে মোট ১৪ জন আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

একই মসজিদে গত ২৫/০৭/২০০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ ‘রায-ই হাকীকত পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মোট ১২ জন আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আবারও উক্ত মসজিদে গত ২২/০৮/২০০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ ‘হাকীকাতুল মাহদী’ পুস্তকের উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মোট ১৫ জন আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

খ) ‘পয়গামে সুলেহ’ ও ‘জরুরতুল ইমাম’ পুস্তকের উপর আলোচনা সভা

গত ১৯/০৯/২০০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ খুলনা মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত ‘পয়গামে সুলহ্’ ও ‘জরুরতুল ইমাম’ পুস্তকের উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মোট ১৩ জন আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

খাকসারের সভাপতিত্বে সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শেখ আলী আকবর, আহাদ পাঠ করান খুলনার জেলা নাযেম জনাব আব্দুর রাজ্জাক এবং সভাপতি সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়।

অতঃপর ‘পয়গামে সুলেহ’ পুস্তকের উপর আলোচনা করেন সর্বজনাব মুহাম্মদ নাসীর উদ্দীন, মুহাম্মদ নুরুল্লাহ্, মুহাম্মদ আবু জাফর ও সভাপতি সাহেব এবং ‘জরুরতুল ইমাম’ পুস্তকের উপর আলোচনা করেন সর্ব জনাব মুহাম্মদ জাফরুল আলম, শেখ আলী আকবর, এস এম, আনসার উদ্দীন ও মুহাম্মদ আব্দুল হাই। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনার শেষ হয়।

গ) ওয়াকারে আমল কর্মসূচী পালন

গত ০১/১০/২০০৮ তারিখ ঈদুল ফিতরের পূর্বে দিবাগত রাত ৮-০০ ঘটিকা থেকে ১০-০০ ঘটিকা পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনা কর্তৃক ‘ওয়াকারে আমল’ কর্মসূচী পালন করা হয়। মসজিদ ও মসজিদ কমপ্লেক্সের ভিতরে ময়লা আবর্জনা সাফ ও মসজিদ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। কর্মসূচীতে ১০ জন আনসার ও ৩ জন খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ সামসুর রহমান
যয়ীম-ই-আলা
মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনা।

শুভ বিবাহ

• গত ৩১/০৭/২০০৮ মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন, পিতা-জনাব বশির আহমদ, কান্দিপাড়া বি, বাড়িয়া এর সাথে এ্যাডভোকেট সিরাজ আহমদ, পিতা-মরহুম সামসুল হক সাং+পোঃ শ্যামপুর থানা ঃ বদরগঞ্জ রংপুর এর বিবাহ ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৩৫/০৮

• গত ১১/০৯/২০০৮ মোছাঃ ফেরদৌসিয়া বখতিয়ার, পিতা-মরহুম এ, এস, এম জহিরুদ্দীন ৭১/১, এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৬ এর সাথে মোহাম্মদ মোমেনুর রশীদ সিদ্দিকী, পিতা-মোজাম্মেল হক ৪৩/এ জয় নগর, ১ম লেন, চকবাজার চট্টগ্রাম এর বিবাহ ৩,০০,০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৩৬/০৮

• গত ১৭/০৮/২০০৮ মোছাঃ মতমা বেগম, পিতা-আহমদ মিয়া, ১০০ শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে সিরজুল ইসলাম লিটন, পিতা-মরহুম বজলুর রহমান, ৩/১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ এর বিবাহ ১,৫০,০০০ (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৩৭/০৮

> *<u>সংশোধনী ঃ</u>* ৩০ সেপ্টেম্বর ’০৮ সংখ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠার ৩য় কলামে ১৩ তম লাইনে *শারমিন বেগম আরাধনা* এর স্থলে শারমিন বেগম আরবিনা ছাপা হয়েছে। অনভিপ্রেত এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দু:খিত।

রিস্তানাতা দপ্তর
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ।

কৃতী ছাত্রী

• অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আমাদের বড় মেয়ে হুমদা ইয়াছমিন (মিশু) [ওয়াকফে নও নম্বর ১৭৩২এ] ২০০৮ইং সালের H.S.C. পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন A+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। এখন সে একজন ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। তার মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এ মাসের শেষের দিকে। আমরা জামাআতের সকল ভাই বোনদের নিকট তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করে দোয়া করার জন্য আবেদন করছি।

পিতা-মনি হোসেন
মাতা-হাসনা হেনা
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বগুড়া।

• আমার মেয়ে ইফরাতুন নূর নিসা এ বছর (২০০৮) H.S.C. পরীক্ষায় বিজ্ঞান গ্রুপ থেকে GPA-5 পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। সে ডাক্তারী পড়তে একান্তভাবে আগ্রহী। তার দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতির জন্য জামাআতের সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ডাঃ ফরিদ আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বরিশাল।

শোক সংবাদ

• অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, মোহাম্মদ আল আমীন (৩৫) পিতা- মোহাম্মদ আলী মিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী গত ২৫ জুলাই সকাল ১০টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। মাত্র দুই বৎসর আগে রঘুনাথপুর বাগ, যশোরে বিয়ে করেছিলেন। তার ইচ্ছানুযায়ী প্রিয় শ্বশুর বাড়ীর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। স্ত্রী ও বহুগুণগ্রাহী রেখে গেছেন তিনি। তার আত্মার মাগফিরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য ধারনের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

• অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, মোহাম্মদ হাশেম আলী গত ২০ আগষ্ট বিকেল ৩টায় বার্ধক্য জনিত কারণে ৯২ বৎসর বয়সে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি রঘুনাথপুর বাগ জামাআতের শহীদ শাহ আলম সাহেবের বড় ভাই। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৪ পুত্র, ২ মেয়ে সহ নাতি নাতনী ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুম আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকে মসজিদে পাঁচ বেলা উচ্চকণ্ঠে আযান দিতেন এবং সুন্দর যুক্তি দিয়ে তবলীগ করতেন। মৃত্যুকালে তার লাজেমী চাঁদা সমুদয় পরিশোধ করে গেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

শাহ্ আলম খান
প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, রঘুনাথপুর বাগ।

কবিতা

খোদা তুমি বিশ্ব কারিগর

খোদা তুমি বিশ্ব কারিগর
জ্ঞানের তোমার নাই সীমা, নাইকো পরিসর।
বিনা স্তম্ভে রেখেছো আসমান, মহাশূন্য পরে
যত জ্যোতিষ্ক সবই নিজ কক্ষে ঘুরে।

বৈচিত্রময় খোদা তোমার শক্তি অপরিসীম
দিবা হতে কর রাত্রি, রাত্রি হতে দিন,
মুর্দা হতে কর জিন্দা, জিন্দারে কর বিলীন।

পবিত্রময় খোদা তুমি, তুমি সর্বজ্ঞানী,
অজ্ঞ মানুষেরে তুমি, করেছ মহাজ্ঞানী।

সৃজনের মূলে খোদা তুমি, খোদ 'খালেকুন'
তোমার ভাষায় শুনালে, তুমি 'কুন ফাইয়াকুন'
যিক্র করে তোমার আমি সদা হই হিম সিম।

–জয়নাল আবেদীন

ওসীয়্যত

নেযামে ওসীয়্যত এক ঐশী ব্যবস্থাপনা
এর অন্তর্ভুক্ত হতে হলে
পরিত্যাগ করতে হবে জাগতিক কামনা
প্রতিষ্ঠিত হবে কাঙ্ক্ষিত সেই অবস্থান
নৈতিকতার চরম বিকাশের বলে।

নেযামে ওসীয়্যত ব্যবস্থা
মু'মিনের জাগতিক মৃতবৎ অবস্থা
ধন-সম্পদ কুরবানী করি
পর পারের জীবন গড়ি।

ওসীয়্যত ওসীয়্যত
এর জন্য অহরহ আসছে নসিহত
মু'মিন যিনি, পূর্ণাঙ্গীণ পবিত্র হবেন তিনি
পরিবর্তন করবেন নিজের হায়সিয়্যত।

ওসীয়্যত ওসীয়্যত
বর্তমান হুযূরের নসিহত
নির্ধারিত হারে হিস্যা আদায়ে
পুত পবিত্র হবে নিজের সম্পদ
অমান্য করলে অন্ধকার হবে ভবিষ্যৎ।

হতে চাও যদি অমর রেখো নিজের মান
ওসীয়্যতকৃত সম্পত্তি কর নিষ্পত্তি
অগ্রে প্রেরণ কর মাল
প্রভু রক্ষা করবেন হাল।

জান, মাল, ওয়াক্ত কুরবানী করি
ঐশী হাবলুল্লাহ-এ ধরি
হৃদয়ের মাঝে পরিবর্তন আনি
দূরীভূত হবে গ্লানি খলীফার আহ্বান মানি।

–মোহাম্মদ মনির হোসেন খাঁন
ওয়াকফে জিন্দেগী

এ পক্ষে কৃষিতে করণীয়

(১৬ অক্টোবর - ৩১ অক্টোবর)
(১ কার্তিক - ১৬ কার্তিক)

চাষী ভাই আপনি প্রতিদিন অন্তত একবার মাঠ পরিদর্শন করুন এবং উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে বা খাকসারের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিন। এপক্ষে কৃষিতে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো আপনি করতে পারেন :

১। চাষী ভাইয়েরা আগাম আমন ধানে আর সার প্রয়োগ করবেন না। তবে দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এবং যে সকল চাষী ভাই বন্যার পানি নেমে যাবার পর অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর এবং তার পরও যে সকল জমিতে আমন চারা রোপন করেছেন সে সকল জমিতে সার প্রয়োগ করুন। মনে রাখবেন সার দেয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকতে হবে। আগাম আমন ধানে ফুল আসা শেষ হয়েছে। এখন দানা শক্ত হবে। আশ্বিনের শেষ এবং কার্তিকের প্রথম খরা দেখা দিলে অবশ্যই সেচ দিবেন। অন্যথায় ফলন কমে যাবে।

পোকার আক্রমণ হলে হাত জাল দিয়ে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন।

খেতে ডাল/কঞ্চি পুতে দিন। পাখি বসার ব্যবস্থা থাকলে পাখিরাই পোকা খেয়ে ফেলবে।

উপকারী পোকা ও প্রাণী যেমন :- ড্যামসেল ফ্লাই, ড্রাগন ফ্লাই, টাইগার বিটল, গুইসাপ, ব্যাঙ সংরক্ষণ করুন। ভাল ফল পাবেন। মনে রাখবেন, দানা বাঁধা শুরু হলে কীট নাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

২। এ পক্ষে ভূট্টা চাষ করার উত্তম সময়। চাষী ভাইয়েরা হাইব্রিড ভূট্টা চাষ করুন, আর্থিক লাভবান হউন। ভূট্টা চাষের জন্য উঁচু সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত দোঁয়াশ মাটি নির্বাচন করুন। জমি তৈরীর সময় শেষ চাষে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া-৬৫০ গ্রাম, টিএসপি-১কেজি, এমওপি-৮০০গ্রম, জিপসাম ১ কেজি,জিংক সালফেট ৪০ গ্রাম, বরিক এসিড-২০ গ্রাম এবং গোবর / কম্পোস্ট সার-২০ কেজি প্রয়োগ করুন।

বীজ কোথায় পাবেন ঃ বিএডিসি অনুমোদিত বিজ ডিলারের নিকট বিজ পাবেন। এম-৫ জাতের হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া বাজারে বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড জাতের ভূট্টা বীজ পাওয়া যায়। আপনার পছন্দের জাত চাষ করতে পারেন।

বীজের হার ঃ ৫ কেজি প্রতি বিঘা।

সতর্কতা ঃ চাষী ভাই ভূট্টা চাষে রোপন থেকে ফুল আসা পর্যন্ত মোট ৪০ দিন খুব সতর্ক থাকতে হয়। কান্ড মাটির ওপরে উঠে না আসা পর্যন্ত জলাবদ্ধতা যেন না হয় সেদিকে সতর্ক থাকবেন।

৩। চাষী ভাই আপনি যদি আগাম আখ চাষ করতে চান তাহলে এ পক্ষে জমিতে চারা রোপন করুন। আঁখ চাষের জন্য দোঁয়াশ মাটি এবং উঁচু /মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করুন। নির্ধারিত মাত্রায় এবং নিয়মে সার প্রয়োগ করুন।

৪। চাষী ভাইয়েরা এ পাক্ষীকে জমি থেকে পানি নেমে যাবার সাথে সাথে বিনা চাষে খেসারী বপন করে একটি বাড়তি ফসল পেতে পারেন।

৫। সরিষা চাষের উত্তম সময় হলো এ পাক্ষিক। যে সকল জমিতে বোরো চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সে সকল জমিতে আমন কাটার পর আগাম "টরি-৭" জাতের সরিষা চাষ করে একটি বাড়তি ফসল নিতে পারেন। বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন।

শেষ চাষে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম, টিএসপি-৬৪০ গ্রাম, এমপিওপি-৩০০ গ্রাম, জিংক সালফেট-২০ গ্রাম, বরিক এসিড-৪০ গ্রাম মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে দিন। বাকী ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করুন।

বীজের হার ঃ ৪০ গ্রাম/শতাংশ।

৬। যে সকল চাষী ভাই আগাম বোরো চাষ করার পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা অবশ্যই এ পাক্ষিকে বীজ তলায় বীজ বপন করে দিন। উর্বর জমিতে বীজ তলা তৈরি করুন। সারের প্রয়োজন হবে না। স্বল্প উর্বর জমিতে বীজ তলা করলে প্রতি বর্গ মিটারে ২ কেজি করে গোবর সার প্রয়োগ করুন। এছাড়া চারা হলুদ হয়ে গেলে চারা গজানোর ২ সপ্তাহ পর প্রতি বর্গ মিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন।

ব্রিধান-২৮ এবং হাইব্রিড এস এল ৮ এইচ জাতের ৩৫-৪০ দিনের চারা রোপন করলে অধিক ফলন পাবেন। তাই কোন সময় রোপন করতে পারবেন সে হিসাব করে বীজ তলা করুন।

মনে রাখবেন বেশি বয়সের চারা রোপন করলে ফলন কম পাবেন।

বিএডিসির অনুমোদিত বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন। বীজ বাজারে আসার সাথে সাথে কাঙ্খিত জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।

৭। কলা একটি বারমাসি ফসল। এটা একটি সহজলভ্য পুষ্টিকর ফল। কলা চাষে আগ্রহী চাষী ভাইয়েরা শবরি, সাগর,কবরি জাতের কলা চাষ করতে পারেন। এ পাক্ষিকে জমিতে চারা রোপন করুন। রোগমুক্ত সুস্থ গাছ থেকে চারা সংগ্রহ করুন।

উর্বর দোয়াঁশ মাটি এবং রোদযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থাসম্পন্ন উঁচু জমি নির্বাচন করুন।

জমি ভালভাবে গভীর করে চাষ করুন। চারা রোপনের একমাস পূর্বে ৬০ সেমি X৬০ সেমি X সেমি গর্ত করে গোবর-১৫

কেজি, টি এসপি-২৫০ গ্রাম, এমওপি-২৫০ গ্রাম ইউরিয়া-৫০০ গ্রাম মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখুন।

৮। গত মাসে যদি শীতকালীন সব্জির চাষ শুরু না করে থাকেন এ পাক্ষিকেই শুরু করুন। ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং, লালশাক, লউ, মিষ্টি কুমড়া, শালগম, গাজর, লেটুস প্রভৃতি দেশী সব্জি চাষের ব্যবস্থা নিন। ভাদ্র মাসে ফুলকপির চারা করে থাকলে চারা তুলে ক্ষেতে লাইন করে রোপন করুন।

বেগুন ও কাঁচা মরিচের বীজ তলা তৈরী করে না থাকলে এখনই জমি প্রস্তত করে বীজ তলায় বীজ বপন করে দিন।

আলু লাগানোর জন্য সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধা যুক্ত উঁচু জমি নির্বাচন করুন এবং জমি তৈরী করুন।

পিয়াঁজ এবং রসুনের কোয়া পাক্ষিকে রোপনের উপযুক্ত সময়। এখনই রোপন করুন।

৯। চাষী ভাইয়েরা পেঁপে বার মাস চাষ করা যায়। চারা করা না থাকলে পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরী করুন। আর চারা করে থাকলে দোয়াঁশ উঁচু জমিতে ২ মিটার অন্তর ৬০ সেমি X৬০ সেমি X ৬০ সেমি গর্ত করে চারা রোপন করুন। গর্তে অবশ্যই অন্যান্য সারের সাথে বিঘায় ১.৫০ কেজি বরিক এসিড ব্যবহার করুন।

জমি পরীক্ষা করে সার ব্যবহার করুন

চাষী ভাইয়েরা কৃষি হলো বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্প। এ শিল্পকে লাভজনক করতে হলে আপনাকে সুচিন্তিত ভাবে মুলধন খাটাতে হবে। এর প্রতিটি উপকরণ সঠিক সময়, মাত্রায় এবং পদ্ধতিতে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চাষী ভাইদের নিকট থেকে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, অধিক পরিমাণে ইউরিয়া সার ব্যবহার করেও পূর্বের ন্যায় এখন আর ফলন পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বীজ, সার, সেচ এবং কীটনাশক এর দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন ব্যয় সীমি রাখার জন্য প্রতিটি উপকরণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাই এজন্য চাই মাটির পরীক্ষা। মাটি পরীক্ষা করে আপনারা জমির সারের অভাব জেনে নিয়ে সব্জি, ফল, মসলা, ও অন্যান্য ফসলে পর্যাপ্ত জৈব সার সহ সুষম সার ব্যবহার করে লাভবান হউন।

মাটি পরীক্ষা কেন করবেন ?

মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ জানা যায়।

মাটিতে ঘাটতি পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনিয়তা ও পরিমাণ জানা যায়।

মাটিতে ডলোচুন/কলিচুন প্রয়োগের প্রয়োজনিয়তা ও পনিমাণ জানা যায়।

ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষমহারে সার প্রয়োগ করা যায়।

স্বল্প ব্যয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারের অপচয় কম হয়।

কিভাবে মাটির নমুনা সংগ্রহ করবেন?

মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রেখে, দীর্ঘসময় ধরে একই জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে, নিয়মিত মাটি পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। এর জন্য সঠিক স্থান থেকে সঠিকভাবে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা দরকার।

নমুনা সংগ্রহে মাটির পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনার সুবিধা মত কোদাল /বেলচা/খন্তা এসবের যে কোন একটি যন্ত্র ব্যবহার করুন।

যে জমির মাটি পরীক্ষা করবেন ঐ জমির চার পাশ থেকে ৪-৫ হাত বাদ দিয়ে ১০-১২টি মাটির নমুনা সংগ্রহের জন্য স্থান নির্বাচন করুন। জমির পরিমাণ অনুযায়ী নমুনার সংখ্যা কম বেশী হতে পারে, তবে নমুনার সংখ্যা বেশী হলে বিশ্লেষিত ফলাফল আরো ভাল হবে।

মাটির নমুনা সংগ্রহের আগে জমির এক স্থানে গর্ত করে লাঙ্গল চাষের গভীরতা দেখে নিন, অর্থাৎ যে গভীরতা থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

নমুনা সংগ্রহের জন্য কোদাল/বেলচা ব্যবহার করে ভি V আকৃতির একটি গর্ত করুন এবং গর্তের এক পাশ থেকে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ (৭-৮ সেমি.) পুরু একটি মাটির চাকা তুলুন।

চাকটির দুই পাশ এবং কর্ষণ তলের অংশ (যদি থাকে) কেটে বাদ দিয়ে চাকটি পলিথিন সিট বা প্লাস্টিকের বালতিতে রাখুন।

সংগৃহিত মাটিগুলো একত্রে ভালোভাবে মিশ্রিত করুন। মাটি মিশ্রিত করার সময় ঘাস বা আগাছা থাকলে শিকড়সহ ফেলে দিন। এখন একটি জমির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মিশ্রিত নমুনা তৈরী হলো

মেশানো নমুনা পলিথিন শিটে সমান ৪ ভাগ করে দু'কোন থেকে দু'ভাগ ফেলে দিন। ২ ভাগ মাটি আবার মিশিয়ে তা থেকে ৪০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ গুঁড়া মাটি পলিথিন ব্যাগে রাখুন।

মাটি ভেজা ও ঢেলাযুক্ত থাকলে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকিয়ে, কাঠের হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়া করে নিন।

এখন সংগৃহিত মাটি পরীক্ষার জন্য পলিব্যাগে লেবেল (চাষীর নাম, ঠিকানা, প্লট নং, জমির পরিমাণ) বা ট্যাগ লাগিয়ে রশি দিয়ে ঐ ব্যাগটির মুখ বন্ধ করুন এবং পরে অন্য একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে দ্বিতীয় ব্যাগটির মুখ বন্ধ করুন। দ্বিতীয় ব্যাগের মুখে আর একটি ট্যাগ লাগিয়ে মাটি পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে পাঠিয়ে দিন।

মাটি পরীক্ষার জন্য আপনার নিকটস্থ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

(কৃষি তথ্য সার্বিস থেকে সংগৃহীত)

বিঃ দ্রঃ – আমন ফসল কাটার পর পরই মাটি পরীক্ষা করে নিন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ
মোবাইল ঃ ০১৯১৩৫২০৬৭২

পাক্ষিক আহমদী গ্রাহক ফরম

নবায়ন / নতুন গ্রাহক

সদস্য কোড (কেন্দ্র পূরণ করবে) ঃ

গ্রাহকের নাম ঃ-

বাংলা ঃ ....

ইংরেজী (ছাপার অক্ষরে) ঃ ....

পিতা / স্বামীর নাম (ইংরেজী বড় অক্ষরে) ঃ ....

জামাতের নাম ঃ ....

হালকা ঃ ....

ফোন/ মোবাইল নং ঃ ....

ই-মেইলঃ ঃ

ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর সঠিক ঠিকানা ঃ

গ্রাম/ মহল্লা ঃ ....

পোস্ট ঃ ....

থানা ঃ .... পোস্ট কোডঃ ....

জেলা ঃ ....

প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ ঃ .... (কথায় ঃ .... টাকা)

বই নং ঃ .... রশিদ নং ঃ .... তারিখ ঃ ....

বিঃ দ্রঃ অনুগ্রহপূর্বক স্থানীয় জামাআতে গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করে রশিদের ফটোকপি ফরমের সাথে সংযুক্ত পূরণ করে কেন্দ্রে প্রেরণ করুন।

গ্রাহকের স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্ট

* পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক হওয়া সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে হলে যোগাযোগ করুন ঃ **০১৯১৮-৩০০১৫৬**